তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট আসিত—কিন্তু তিনি এই সমস্ত সান্ত্বনা সত্বেও, পুত্রদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য বন্ধুবান্ধবদিগকে পরিত্যাগ করিয়া জেনিবায় চলিয়া গেলেন। পুত্রের শিক্ষা সমাপন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় গিজো মাতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া আইন শিক্ষা করিবার জন্য প্যারিস নগরীতে যাত্রা করিলেন। মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন বটে কিন্তু তাঁহার মাতার অবিচলিত কঠোর সত্যানুরাগ ও ধর্ম্মানুরাগকে তাঁহার সঙ্গের সাথী করিয়া লইলেন।

কার্লাইলের মাতা আর একটি উচ্চদরের স্ত্রীলোক। তিনি বুদ্ধিমতী ও ধর্ম্মিষ্ঠা কার্লাইলের লেখায় যে সত্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায় তাহার কারণ তাঁহার মাতা তাঁহার শৈশবাবস্থায় অতি যত্নসহকারে সেই সকল উচ্চ ও মহান ভাব তাঁহার মনে রোপণ করিয়া দিয়াছিলেন। এবং এই জন্য কার্লাইল তাঁহার মাতাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিতেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রসিদ্ধ প্রাকৃত ইতিহাসতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত (Cuvier) কুবিয়ের মাতা সুশিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি অতি যত্নের সহিত পুত্রকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই মাতৃঋণ তিনি কখনই ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার মাতা যে সকল ফুল ভাল বাসিতে ছেলেবেলায় তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন সেই সকল ফুল যদি তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহার ঘরে আনিয়া দিত, তিনি আহ্লাদে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িতেন। যাঁহাদের সংস্কার আছে যে স্ত্রীলোকদের লেখা পড়া শেখানো ভাল নহে তাঁহারা এই সকল দৃষ্টান্ত আলোচনা করুন।

---

# টাহেটি দ্বীপের পার্ল্যামেণ্ট।

পার্ল্যামেণ্ট কথাটা শুনিতে যত সহজ, তাহার কার্য্যপ্রণালী আসলে ততটা সহজ নয়। দশজনে মিলিয়া কাজ করিলে কাজ সহজ হয় বটে কিন্তু সেই মেলামেশাটা নিতান্ত সহজ নহে। নিজের স্বার্থের জন্যও পাঁচ জনে মেলা সহজ, কিন্তু দেশের স্বার্থের জন্য, সাধারণের হিতের জন্য মিলিত হওয়া সুকঠিন। ইহার জন্যে হৃদয়ের ও বুদ্ধির যথেষ্ট উন্নতি হওয়া আবশ্যক। তা'ও যেন হইল, কিন্তু আত্মসংযম করিতে যাহারা না শিখিয়াছে, পার্ল্যামেণ্ট বাঁধা তাহাদের কর্ম্ম নহে। যে জাতি বাক্‌সর্ব্বস্ব, দুর্ব্বল অথচ অহঙ্কারে স্ফীত, তাহারা আপনার কথাই পাঁচকাহন করিয়া তোলে, অন্য সকলের মুখ চাপা দিয়া সপ্তম স্বরে নিজের ক্ষুদ্র মত জারি করিতে চায়; দেশ, বিদেশ, ভাল, মন্দ, সমস্ত চুলায় যায়, চীৎকারের চোটে ভূত ভাগিয়া যায়, মুখোমুখী রুখোরুখী

করিয়া শেষকালে দুই এক জন করিয়া বাকিয়া বসিতে থাকেন। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে সমগ্র য়ুরোপে যখন সমরাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তখন সিসিলি দ্বীপ কিছু দিনের মত ইংরাজের করায়ত্ত হয়। দ্বীপবাসীরা ইতিপূর্ব্বে তেমন রাজনৈতিক শিক্ষা পায় নাই অথচ সেখানে একেবারে ইংলণ্ডের অনুরূপ পার্ল্যামেণ্ট বসান হইল। ফল হইল কি? একজন স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়াছিলেনঃ—"সিসিলিতে প্রতিনিধি-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে পর রোজ রোজ সেখানে যে কাণ্ডের অভিনয় হইত, কেহ তাহার বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারে না। পার্ল্যামেণ্ট গৃহে বিজ্ঞতা বা ধীরতার নামগন্ধ নাই—ঠিক যেন বাতুলালয়। নির্ব্বাচনের সময় ইংলণ্ডের ঘাটে মাঠে যেরূপ গোলযোগ কীর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, সিসিলির সিনেট্ গৃহে তাহাই হইতে লাগিল। সভাপতির কথায় কেহ মন দেয় না, গোলে তাঁহার কথা শুনা যায় না। হয়ত সভাস্থ সকলেই এককালে বক্তৃতা করিতে দাঁড়ায়। ভিন্ন ভিন্ন দলের লোক বিবাদে মত্ত হইল, সভাস্থলে লাঠালাঠি চুলোচুলি বাধিয়া গেল। কতদিন এমন চলে? সাধের পার্ল্যামেণ্ট এক বৎসরেই ভাঙ্গিয়া গেল, তাহার বদলে সামরিক আইন চালাইতে হইল।"

এই সকল কথা মনে করিলে আশ্চর্য্য বোধ হয় যে টাহেটি দ্বীপের অসভ্য অধিবাসীরা কিরূপে সুশৃঙ্খলে পার্ল্যামেণ্ট চালাইয়া আসিতেছে! রাজারা কর্ত্তব্য বোধে সহজে আপনার অধিকার ছাড়িতে চায় না—কিন্তু টাহেটি দ্বীপের রাজারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপনাদের যথেচ্ছাচার অধিকার বিসর্জ্জন করিয়া পার্ল্যামেণ্ট আহ্বান করেন। সহজ কথা নহে। প্রথম চার্ল্‌স্ নিজের মাথাটা দিয়াছিলেন কিন্তু স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে পারেন নাই। তিনি সভ্য দ্বীপের রাজা, টাহেটি অসভ্য দ্বীপ! টাহেটি দ্বীপে যে দিন প্রথম পার্ল্যামেণ্ট বসিল, সেই দিনের বিবরণ আমরা বর্ণনা করিব। সেই দিনকার পার্ল্যামেণ্টে খৃষ্টধর্ম্মে সদ্যোদীক্ষিত টাহেটি বাসীরা "নরহত্যায় প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত কি না" এই বিষয়ে বিচার করিয়াছিল। আমাদের আপনাদের মধ্যে সম্প্রতি এই ফাঁসির ঔচিত্য সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইয়া থাকে। পুরাতন খৃষ্টানেরা ত ফাঁসি দিতেছে দেখিতেছি—নূতন খৃষ্টানেরা এ বিষয়ে কি কথা বলে শুনা যাক্।

দক্ষিণ সাগরে টাহেটী ও তাহার নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইলে পর, অধিবাসীরা পাদরী সাহেবদের কাছে রাজনীতি শিখিতে চাহিল। ভাল আইন ও উপযুক্ত শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইলেই তাঁহারা স্ব স্ব প্রভুতা এবং আপনাদের রাজতন্ত্র ত্যাগ করিতে রাজি আছেন, সর্দ্দারেরা (Chiefs) আনন্দের সহিত একথা প্রচার করিলেন। অনেক পরামর্শ যুক্তির পর সর্দ্দারদের অনুরোধে পাদরী সাহেবেরা আইন কানুন ও শাসন প্রণালীর একটা খসড়া প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদের কাছে পেস্ করিলেন। বিচার্য্য প্রস্তাবগুলি মীমাংসার জন্য দেশের সর্দ্দার ও প্রধান প্রধান লোকের এক বৃহৎ সভা আহ্বান করা হইল।

নির্দ্ধারিত দিনে সভা বসিল। টাহেটীর রাজপরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষগণ, ও প্রধান প্রধান সর্দ্দারদের বংশধরেরা (ইহাঁরা পুরুষানুক্রমে ব্যবস্থাপক) সভাক্ষেত্র উজ্জ্বল করিলেন। সাধারণ লোকের দ্বারা নির্ব্বাচিত প্রত্যেক জিলা হইতে দুই জন করিয়া প্রতিনিধিও আসিয়াছিলেন। টাহেটী এবং পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য দ্বীপবাসীদের আসিবার সুবিধা হইবে বলিয়া পেপাওয়া নামক স্থান সভার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। প্রধান পাদরী নট সাহেবকে সভাপতির পদে বরণ করা হইয়াছিল। সভাপতি ছাড়া সভার সকল সভাই দেশীয় এবং উইণ্ডওয়ার্ড দ্বীপ সমূহে শাসনপ্রণালী ও আইন কানুন নির্দ্ধারণের জন্য প্রথম দেশীয় পার্লামেণ্টও সেই। ইহার পূর্ব্বে যে কোন সভা বসিত, তাহার উদ্দেশ্য হয় যুদ্ধ, নয় তদ্রূপ কোন অন্যায় কাজ।

সর্দ্দার এবং সাধারণ লোকের প্রার্থনা মত পাদরী নট সাহেব আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন, নানা সভাসমিতিতে বারংবার বিচার করিয়া শেষে স্থির হইয়াছিল যে উহাই শাসন প্রণালীর ভিত্তি স্বরূপ গণ্য হইবে। এই আইন চল্লিশ ধারায় বিভক্ত হয়। সাধারণের জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতা যাহাতে সম্যক্ রক্ষা হইতে পারে, তাহার কোন বিধানেরই ইহাতে অভাব ছিল না। যথা চুরী করিলে তাহার শাস্তি স্বরূপে চোরকে চৌর্য্যের চারিগুণ দণ্ড দিতে হইবে। আবার চুরী করিলে উর্দ্ধসংখ্যা পাঁচ বৎসর কঠিন পরিশ্রম সহ কারাবাস। কেহ মাতলামি করিলে প্রথমবারে বিচারক আদালতে সর্ব্ব সমক্ষে সাবধান করিয়া দিবেন, কিন্তু পর পর বারে কঠিন পরিশ্রম। উল্‌কি পরিয়া শরীর বিশ্রী করিলেও পূর্ব্বে আইনমত সাজা হইত, এক্ষণে সেরূপ প্রথা উঠিয়া গেল। প্রতিবেশীবর্গের কোন অনিষ্টকর না হইলেই হইল, এমন কাজ যাহার যেমন ইচ্ছা নির্ব্বিবাদে করিতে পারিবে এরূপ ব্যবস্থা দেওয়া হইল।

টাহেটীর জন্য সাত জন এবং এইমিওর জন্য দুই জন প্রধানতম জজ ছাড়া বিচার কার্য্য নির্ব্বাহার্থ অনেক মাজিষ্ট্রেট্ ও জজ নিযুক্ত হইল। ইহাঁদের মধ্যে অন্ততঃ দুই জন প্রত্যেক জিলার জন্য। জুরিতে ছয় জন বসিবার ব্যবস্থা হইল, আর তাঁহারা স্বশ্রেণীর লোক হওয়া চাই। অধিকাংশ বিধান আইনে পরিণত করার পূর্ব্বে গুরুতর তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল—হত্যাকারীর প্রাণ দণ্ড হওয়া উচিত কি না এই প্রশ্নের মীমাংসায় সকলের চেয়ে অধিক সময় লাগিয়াছিল। প্রাণদণ্ডই বিহিত না যাবজ্জীবন জনশূন্য দ্বীপান্তরই বিহিত? সকলের নিকটে একবাক্যে শেষের শাস্তিটাই গ্রাহ্য হইল। এই সম্বন্ধে যে সব তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল, আজ আমরা তাহাই বালকের পাঠকদিগকে উপহার দিব। একচল্লিশ বৎসর আগে দক্ষিণ সাগরের ক্ষুদ্র দ্বীপের নিরক্ষর অধিবাসীরা কেমন করিয়া এরূপ সুবিবেচনা, সহৃদয়তা এবং আগ্রহের সহিত ধীরে ধীরে এমন তর্ক বিতর্ক করিয়াছিল, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

বিচার্য্য বিষয়—নরহত্যার শাস্তি কেবল নির্জ্জনদ্বীপান্তর হওয়াই উচিত কি না?

পেপের প্রধান সর্দ্দার, সভাপতি এবং সমস্ত সভাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—"এ আইনটী যে বড় ভাল, তার সন্দেহ নাই। কিন্তু কিছু দিন হইতে আমার মনে একটা কথা উঠিয়াছে, আপনারা আমার কথা শুনিলেই বুঝিতে পারিবেন। ইংলণ্ডের নিকট হইতে আমরা অনেক উপকার পাইয়াছি,—সেখানকার আইন কি মন্দ হইতে পারে? তথায় নরহত্যার দণ্ড ফাঁসি। আমার বিবেচনায় আমাদের এখানেও তাহা হইলে ভাল হয়।"

বুয়ানেউয়ার প্রধান সর্দ্দার উঠিবার আগে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ দাঁড়াইয়াছেন কি না? তিনি বলিলেন—"পেপের প্রধান সর্দ্দার ঠিক্ বলিয়াছেন, আমরা ইংলণ্ডের দয়ালু খৃষ্টান মহাশয়দের কাছে অনেক উপকার পাইয়াছি। বাস্তবিক্ আমরা বিস্রিটেনের কাছে না পেয়েছি কি? এমন যে পরম ধন বাইবেল, তাহা আমরা সেখান থেকেই পেয়েছি। কিন্তু হিটিওটি একটু বেশী বেশী বলিয়াছেন। আমরা যদি ইংলণ্ডের আইনকে আদর্শ করি, তবে সিঁদ দিলে, জাল করিলে অথবা গোরু ছাগল চুরী করিলেও বিধান করিতে হয়—প্রাণদণ্ড। ভাল, টাহেটীতে এমন কেহ আছে কি যে এ সব অপরাধে প্রাণদণ্ড করা উচিত বলিবে? না, তা হতে পারে না, সেটা নিতান্ত বাড়াবাড়ি করা হয়। আমার বোধ হয় আমাদের আইন যা হয়েছে, সেই ভাল। হয়ত আমার ভুল হয়েছে, কিন্তু আমার ত এই রকমই ভাল বোধ হয়।"

একটু পরে উপপারু নামক একজন প্রধান সর্দ্দার উঠিলেন। ইহাঁকে দেখিয়াই মনে হইল, ইনি খুব বুদ্ধিমান আর উন্নত চেতা। তাঁহার চেহারায় ভাণের লেশমাত্র নাই—সরলতা সর্ব্বত্র, আর মুখে যেন জ্যোতি ফুটিতেছিল। তিনি পূর্ব্ববক্তাদিগের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "তাঁহার বিবেচনায় কোন কোন বিষয়ে তাঁহারা কতক ঠিক কতক ভুল বলিয়াছেন। ভাই হিটোটী যে বলেন ইংলণ্ডে ফাঁসির চলন আছে ব'লে আমাদেরও তাই করিতে হবে, সেটা ভুল, উত্তামী তাহা বুঝাইয়াছেন। কেন না ইংলণ্ডের আইন ভাল হলেও আমাদের আদর্শ হতে পারে না। আমাদের আদর্শ বাইবেল। সে দিন মিসনরী সাহেব আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছিলেন যে বাইবেলে বলে, "মানুষের রক্ত যে পাত করিবে, মানুষেই আবার তারও রক্ত পাত করিবে। তিনি ইহাও বলিলেন যে ইংলণ্ডের আইনের হেতুও তাই। অতএব আমি উত্তামীর মতে সায় দিতে পারি না—হিটোটীর কথাই ঠিক, (তবে ইংলণ্ডের আইন বলিয়া নহে, বাইবেলের আজ্ঞা বলিয়াই শিরোধার্য্য)। আমাদের এখানেও নরহত্যার মৃত্যু শাস্তি হওয়া উচিত।"

এই বক্তৃতা শেষ হইলে সভাক্ষেত্রে সকলেই পরস্পরের দিকে প্রশংসমান চক্ষে চাহিতে লাগিল—উপপারু যে ইংলণ্ডের দোহাই না দিয়া বাইবেলকে শিরোধার্য্য করিয়াছেন, সভ্যেরা ইহাতে বড়ই সুখী হইলেন। তারপর আর একজন সর্দ্দার উঠিলেন। দেখিয়াই বোধ হইল ইনি দেশের একটা চূড়া স্বরূপ। বাস্তবিক ইহাঁর চেহারা, পোসাক

এবং দাঁড়াইবার ভঙ্গী দেখিয়া সকলে শেষ বক্তাকেও ভুলিয়া গেল। ইহাঁর নাম টাটী— পূর্ব্ববক্তাদের মত ইহাঁরও সরলতা এবং বিনয়ের কোন ত্রুটি ছিল না। তিনি বলিলেন—"আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ বোধ হয় বিস্মিত হইয়াছেন, যে বংশ গৌরবে রাজপরিবারের ঠিক পরবর্ত্তী ঘরের সর্ব্বপ্রধান সর্দ্দার হইয়াও আমি এতক্ষণ কিছু বলি নাই কেন? এখানে এই গুরুতর বিষয়ে অন্যান্য ভ্রাতৃবর্গ কে কি বলেন শুনিতে আমার বাসনা হইয়াছিল। এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছিলাম, সে বড়ই ভাল হয়েছে, কেননা আমি যা ভাবিয়া আসি নাই, এমন কোন কোন কথা আমার মনে এখন উদয় হইতেছে। আমার পূর্ব্ব বক্তারা সকলেই ভাল কথা বলিয়াছেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, উপপাক্রুর কথা কি ঠিক্ হিটোটীর মতই নয়? মনে করুন, হিটোটী যেমন বলিয়াছেন, ইংলণ্ডের আইন প্রতিপদে আমরা অনুসরণ করিতে পারি না—কেন না তাহাতে বড় বাড়াবাড়ি হইয়া উঠে—আচ্ছা, ঠিক্ সেই তর্ক ধরিয়াই আমরা উপপাক্রুর মতও ত গ্রহণ করিতে পারি না। তিনি বলেন বাইবেলই আমাদের একমাত্র আদর্শ। বেশ, কিন্তু বাইবেলে যে বলে, 'যে মানুষ নররক্ত পাত করিবে, মানুষেই আবার তারও রক্ত পাত করিবে'—এর মানে কি? ইংলণ্ডের আইন সব মানিয়া চলিলে যে বিভ্রাট, ইহাতেও কি তাহাই হয় না? আমার নাম টাটি, মনে করুন আমি এক জন জজ, আমার কাছে যে আসামীর বিচার হইতেছে সে রক্তপাত করিয়াছে। আমি তাহার পক্ষে মৃত্যুদণ্ড বিধান করিলাম। আমি তার রক্তপাত করিলাম—আমার রক্ত পাত করিবে কে? কাজেই দেখুন, এতদূর যখন যাওয়া যায় না, তখন সেটা কোন কাজের কথা নয়। আমার বোধ হয়, ঐ কথাগুলির ও অর্থ হইতে পারে না। এমতও ত হইতে পারে যে প্রভু যীশুখৃষ্ট ওলড টেষ্টামেণ্টের অনেক বিধি বর্জ্জন করিয়াছিলেন—ওটাও ত সেই বর্জ্জিত বিধির অন্তর্গত হইতে পারে? কিন্তু আমার তেমন জানা শুনা নাই, যদি কেহ আমায় দেখাইয়া দিতে পারেন যে রক্তপাত বিধিটা নিউ টেষ্টামেণ্টে আমাদের ত্রাণকর্ত্তা অথবা তাঁহার শিষ্য কাহারও কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, তবে তাহা আমাদিগকে অবশ্য মানিতে হইবে।"

টাটীর বক্তৃতা শেষ হইলে সভাক্ষেত্রে খুব বাহবা পড়িয়া গেল।

এবার যিনি উঠিলেন, নামটী তাঁর পারি, এইমিয়োর প্রধান বিচারপতি, আগে অরোর প্রধান পুরোহিত ছিলেন। ইনিই প্রাণের ভয় না করিয়া সর্ব্ব প্রথমে পৌত্তলিক উপাসনা পরিহার করেন। ইনি বলিলেন—"আমার হৃদয়, চিন্তা বিস্ময় আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে। যখনই আমি এই উপাসনালয়ে (ফারেকুরেরা) চারি দিকে চাহিয়া দেখিতেছি, তখনই আমার অতিশয় আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে (মিয়াহুরু এ) মনে বড় আহ্লাদ হইতেছে (মিয়া ফেয়াওয়াবাতে আউ)। টাটী ঠিক্ মীমাংসা করিয়াছেন—বাইবেলই ত বাস্তবিক আমাদের পথদর্শক। তাহাতে মৃত্যু দণ্ডের বিধান আছে, কে বলিল? আমি উহার এমন

অনেক স্থল দেখিয়াছি, যাহাতে তাহার নিষেধ আছে—বিধি কোথাও দেখি নাই। আরও একটা কথা আমার মনে উঠিতেছে, যদি আপনারা আমার ক্ষুদ্র বক্তৃতাটী শুনেন ত বুঝিতে পারিবেন। পাপার দণ্ড আইন মতে যদি মৃত্যু হয়, তবে আমাদের পক্ষে বড় ভাল। কেন বলুন দেখি—খৃষ্টানেরা শাস্তি দেন কেন? আমাদের রাগ আছে, লোককে কষ্ট দিতে পারিলে সুখ হয়—এই জন্য কি? যখন আমরা খৃষ্টধর্ম্ম মানিতাম না, তখন প্রতিশোধ লইতে ভাল বাসিতাম—এখনও তাই ভালবাসি, এই জন্য কি? না না—খৃষ্টানেরা প্রতিহিংসাপ্রিয় নন—তাঁহাদের ক্রোধপরায়ণ হওয়া উচিত নয়; আর কষ্ট দিয়া তাঁহারা সুখ বোধ করিতেই পারেন না। কাজেই এসবের জন্য খৃষ্টানেরা শাস্তিও দেন না। পাপীকে শাস্তি দেওয়া হয় কেন, না সে আর পাপ করিবে না এবং তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া অন্যেও পাপ করিতে ভয় পাইবে। কেমন, ইহাই ত? বেশ, আপনারা বলুন ত, পলকে প্রাণ বিযুক্ত হইবে সেইটাই বেশী ভয়, না টাহিটী হইতে কোন জনশূন্য দ্বীপে চিরনির্ব্বাসন যন্ত্রণাই বেশী কষ্টকর? সে কি আর নরহত্যা করিতে পারে? আর অন্যেরা কি সে শাস্তি দেখিয়া মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে বেশী ভয় পাবে না? এই জন্য বলি যে টাটীর কথাই ঠিক্—আমাদের আইনে যেমন লেখা হইয়াছে, তাহাই বাহাল থাক্।"

এতক্ষণে সাধারণ লোকের মধ্যেকার একজন উঠিলেন—ইনি কোন জিলার একজন প্রতিনিধি। এতক্ষণ বড় বড় লোকদের বক্তৃতা যেমন মনোযোগের সহিত শুনিতে-ছিলেন, সভ্যেরা ইঁহার বক্তৃতাও সেইরূপ শুনিতে লাগিলেন। ইনি বলিলেন দেখিতেছি, আর কেহ কিছু বলিতে উঠিতেছেন না, আমার মনে কতকগুলি কথা উঠেছে, দুই পাঁচ কথায় বলিব, আপনারা দয়া করে শুনুন। যা কিছু বলার ছিল সর্দ্দার মহাশয়েরা তার কিছুই বোধ হয় বাকী রাখেন নাই—কিন্তু কোন বড়লোক একটা প্রস্তাব করিলেন বলিয়া তাহাতে সায় দিতে হইবেই, এ সভা তেমন নহে। আমরা সকলে মিলিয়া যা বলিব,—যে অবস্থার লোকই কেন হউক না—তার মধ্যে সার সার পরামর্শগুলি আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। আমিত এই রকম বুঝি। টাটীর সকল কথাই সুন্দর—কিন্তু পাপীকে সংশোধন করা যে দণ্ডনীতির একটা যুক্তি,তা তিনি বলেন নাই। সে দিন একজন মিসনরি আইনটী পড়িতে পড়িতে ইহা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। আচ্ছা, নরহন্তাকে যদি মারিয়া ফেলা হয়, তবে আমরা তার ভাল করিলাম কি? তার চেয়ে নির্জ্জন দ্বীপে তাহাকে পাঠাইলে একা থাকিতে থাকিতে সে আত্ম চিন্তা করিবে, বিধাতার ইচ্ছায় তার মনের পাপ রাশি দূর হইয়া তার জীবন ক্রমে পবিত্র হইতে পারে। কিন্তু তাহাকে মারিয়া ফেলিলে, তার আত্মার গতি কি হইবে?"

আরও অনেকে এই কথার সমর্থন করিল। সেই দিন হইতে সেই বর্ব্বর রাজ্যে প্রাণ-দণ্ড উঠিয়া গিয়াছে।

---

# রুদ্ধ গৃহ।

বৃহৎ বাড়ির মধ্যে কেবল একটি ঘর বন্ধ। তাহার তালাতে মরিচা ধরিয়াছে—তাহার চাবি কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সন্ধ্যা বেলা সে ঘরে আলো জ্বলে না, দিনের বেলা সে ঘরে লোক থাকে না—এমন কতদিন হইতে কে জানে!

সে ঘর খুলিতে ভয় হয়, অন্ধকারে তাহার সমুখ দিয়া চলিতে গা ছম্‌ছম্‌ করে। যেখানে মানুষ হাসিয়া মানুষের সঙ্গে কথা কয় না, সেই খানেই আমাদের যত ভয়। যেখানে মানুষে মানুষে দেখাশুনো হয়, সেই পবিত্রস্থানে ভয় আর আসিতে পারে না। যে পথে মানুষ সর্ব্বদা চলে-ফিরে সেখানে কণ্টক বৃক্ষ জন্মাইতে পারে না।

দুই খানি দরজা ঝাঁপিয়া ঘর মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে। দরজার উপর কান দিয়া থাকিলে ঘরের ভিতর হইতে যেন হু হু শব্দ শুনা যায়।

এ ঘর বিধবা। একজন কে ছিল সে গেছে, সেই হইতে এ গৃহের দ্বার রুদ্ধ। সেই অবধি এখানে আর কেহ আসেও না, এখান হইতে আর কেহ যায়ও না। সেই অবধি এখানে যেন মৃত্যুরও মৃত্যু হইয়াছে। সকলেরই এমন একজন আছে যে মরিলে পৃথিবীর আর সকলই মরিয়া যায়—পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় মৃত্যু থাকে না।

এ জগতে অবিশ্রাম জীবনের প্রবাহ মৃত্যুকে হু হু করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়, মৃত্যু কোথাও টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। এই ভয়ে সমাধি ভবন মৃত্যুকে পাথর চাপা দিয়া রাখে, মৃত্যুকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখে। কৃপণ যেমন তাহার বহুমূল্য মাণিকটি লোহার সিন্ধুকের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখে, সমাধিভবন তেম্‌নি মৃত্যুর কঙ্কালটিকে বহুমূল্য রত্নের মত চোরের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পাষাণ প্রাচীরের মধ্যে লুকাইয়া রাখে, ভয় তাহার উপরে দিবারাত্রি পাহারা দিতে থাকে। মৃত্যুকেই লোকে চোর বলিয়া নিন্দা করে, কিন্তু জীবনও যে চকিতের মধ্যে মৃত্যুকে চুরি করিয়া আপনার বহুবিস্তৃত পরিবারের মধ্যে বাঁটিয়া দেয় সে কথার কেহ উল্লেখ করে না।

পৃথিবীর এমন কোন্‌ থানে আমরা পদক্ষেপ করিতে পারি যেখানে মৃত জীবের সমাধি নাই। কিন্তু পৃথিবীর দ্বার অবারিত। পৃথিবী মৃত্যুকেও কোলে করিয়া লয় জীবনকেও কোলে করিয়া রাখে—পৃথিবীর কোলে উভয়েই ভাই বোনের মত খেলা করে। জীবের এই প্রকাণ্ড সমাধি-গোলকের উপরে আমরা নির্ভয়ে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াই। যদি প্রত্যেক ক্ষুদ্র মৃত্যুকে পৃথিবী চিহ্নদ্বারা জীবিত করিয়া রাখিত, মৃত্যু-চিহ্নে এ পৃথিবী একেবারে কণ্টকিত হইয়া উঠিত, তবে এ পৃথিবীর সূর্য্যালোক ম্লান হইয়া যাইত আমাদের মুখের হাসি বিলীন হইত, আমাদের এই উৎসবময়ী ধরণী সুগভীর নিস্তব্ধ শোকের আবাস ভূমি হইত। আজ দেখ, চিতাভস্মের উপরে লতা লুটাইয়া

পড়ে ফুল ফুটিয়া উঠে—প্রকৃতি জননীর স্নেহ অবিশ্রাম কাজ করে, আমাদের অশ্রুজল মুছাইয়া দেয়, আমাদের ম্লান মুখে হাসি জাগাইয়া তোলে। এই জীবনমৃত্যুর প্রবাহ দেখিলে, তরঙ্গভঙ্গের উপর ছায়া-আলোর খেলা দেখিলে আমাদের কোন ভয় থাকে না, কিন্তু বদ্ধ মৃত্যু রুদ্ধ ছায়া দেখিলেই আমাদের ভয় হয়। মৃত্যুর গতি যেখানে আছে, জীবনের হাত ধরিয়া মৃত্যু যেখানে একতালে নৃত্য করে, সেখানে মৃত্যুরও জীবন আছে, সেখানে মৃত্যু ভয়ানক নহে; কিন্তু চিহ্নের মধ্যে আবদ্ধ গতিহীন মৃত্যুই প্রকৃত মৃত্যু, তাহাই ভয়ানক। এই জন্য সমাধিভূমি ভয়ের আবাস স্থল।

পৃথিবীতে যাহা আসে তাহাই যায়। এই প্রবাহেই জগতের স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। কণামাত্রের যাতায়াত বন্ধ হইলে জগতের সামঞ্জস্য ভঙ্গ হয়। জীবন যেমন আসে, জীবন তেমনি যায়; মৃত্যুও যেমন আসে মৃত্যুও তেমনি যায়। তাহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা কর কেন? হৃদয়টাকে পাষাণ করিয়া সেই পাষাণের মধ্যে তাহাকে সমাহিত করিয়া রাখ কেন? তাহা কেবল অস্বাস্থ্যের কারণ হইয়া উঠে। ছাড়িয়া দাও তাহাকে যাইতে দাও—জীবনমৃত্যুর প্রবাহ রোধ করিও না। হৃদয়ের দুই দ্বারই সমান খুলিয়া রাখ। প্রবেশের দ্বার দিয়া সকলে প্রবেশ করুক, প্রস্থানের দ্বার দিয়া সকলে প্রস্থান করিবে।

গৃহ দুই দ্বারই রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যে দিন দ্বার প্রথম রুদ্ধ হইল সেই দিনকার পুরাতন অন্ধকার আজও গৃহের মধ্যে একলা জাগিয়া আছে। গৃহের বাহিরে দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি আসিতেছে, গৃহের মধ্যে কেবল সেই একটি দিনই বসিয়া আছে। সময় সেখানে চারিটি ভিত্তির মধ্যেই রুদ্ধ। পুরাতন কোথাও থাকে না, এই ঘরের মধ্যে আছে।

এই গৃহের অন্তরে বাহিরে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হইয়াছে। বাহিরের বার্ত্তা অন্তরে পৌঁছায় না, অন্তরের নিঃশ্বাস বাহিরে আসিতে পায় না। জগতের প্রবাহ এই ঘরের দুই পাশ দিয়া বহিয়া যায়। এই গৃহ যেন বিশ্বের সহিত নাড়ির বন্ধন ছেদন করিয়াছে।

দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহ পথের দিকে চাহিয়া আছে। যখন ছেলেদের খেলা করিতে দেখে, তখন তাহার কি মনে হয় না জানি! পথে যখন কেহ গান গাইয়া চলিয়া যায় তখন তাহার অন্ধকারের মধ্যে প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠে কি না কে জানে। যখন পূর্ণিমার চাঁদের আলো তাহার দ্বারের কাছে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকে, তখন তাহার দ্বার খুলিব-খুলিব করে কি না কে বলিতে পারে! পাশের ঘরে যখন উৎসবের আনন্দধ্বনি উঠে তখন কি তাহার অন্ধকার ছুটিয়া যাইতে চায় না? এ ঘর কি ভাবে চাহে, কি ভাবে শোনে আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না।

ছেলেরা যে-একদিন এই ঘরের মধ্যে খেলা করিত, সেই কোলাহলময় দিন এই গৃহের নিশীথিনীর মধ্যে পড়িয়া আজ কাঁদিতেছে। এই গৃহের মধ্যে যে সকল স্নেহ-প্রেমের অভিনয় হইয়া গিয়াছে, সেই স্নেহ-প্রেমের উপর সহসা কপাট পড়িয়া গেছে,

তাহারা বাহির হইবার পথ খুঁজিতেছে—এই নিস্তব্ধ গৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া আমি তাহাদের ক্রন্দন শুনিতেছি। স্নেহ প্রেম বদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য হয় নাই। মানুষের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাহাকে গোর দিয়া রাখিবার জন্য হয় নাই। তাহাকে জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে সংসারক্ষেত্রের জন্য সে কাঁদে। স্নেহ প্রেম সংসারক্ষেত্রে চির নূতন প্রাণ লইয়া বিচরণ করিবে—স্নেহ প্রেম মনুষ্যত্বের সন্তান, সকল মানবেরই তাহার প্রতি অধিকার আছে—তোমার মৃত প্রিয়জনের স্মৃতির সঙ্গে যে তাহাকে তুমি অন্ধকারের মধ্যে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিবে, এ কি অবিচার! তুমি যখন একবার একটি ছেলেকে কোলে করিয়াছ, তখন, সে ছেলে চলিয়া গেলেও অন্য ছেলেকে তোমার কোল হইতে বঞ্চিত করিতে পার না।

তবে এ গৃহ রুদ্ধ রাখিও না—দ্বার খুলিয়া দাও। কারাবাসী শোক, স্মৃতি ও মৃত্যু ছাড়া পাইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে পালাইয়া যাইবে। সূর্য্যের আলো দেখিয়া মানুষের সাড়া পাইয়া চকিত হইয়া ভয় প্রস্থান করিবে। সুখ এবং দুঃখ, শোক এবং উৎসব, জন্ম এবং মৃত্যু পবিত্র সমীরণের মত ইহার বাতায়নের মধ্যে দিয়া চিরদিন যাতায়াত করিতে থাকিবে। সমস্ত জগতের সহিত ইহার যোগ হইয়া যাইবে।

---

# জীবন-সংগ্রাম।*

জীবন-সংগ্রাম কথাটা এক্ষণে বহুল প্রচলিত হইয়াছে। সাহিত্য এবং ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং দর্শন, সর্ব্বত্র ইহার প্রয়োগ হইতেছে। কথাটার আসল মানে কি, অল্পের মধ্যে জানা মন্দ নয়।

ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা বিখ্যাত ডারুইন সাহেব। তিনি বলেন যে ইহা রূপক বাক্য, এক-জনের উপর অন্যের নির্ভরের ভাব প্রকাশ করে। তাহাতে শুধু কোন এক ব্যক্তির জীবনের কথাই যে বুঝায় এমত নহে, কিন্তু তাহা ছাড়া সন্তান সন্ততি রাখিয়া যাওয়ার যে সামর্থ্য, তাহাও বুঝাইয়া থাকে। মনে কর, দুইটা শ্বাপদ জন্তু এক সময়ে এমন জায়-গায় বাস করিতেছে, যেখানে মাংসের বড় টানাটানি। জন্তু দুইটার মধ্যে যে কোন রকমে আহার সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করিল, জীবন-সংগ্রামে তাহার জয়লাভ হইল। যে মাংস সংগ্রহ করিতে পারিল না সে মরিয়া গেল, কিন্তু যে পারিল সে আত্মরক্ষা ত করিলই, তা ছাড়া সন্তান সন্ততি রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিল। মরুভূমির প্রান্তে যে ক্ষুদ্র গাছটী জলের অভাবে বাড়িতে পারিতেছে না, ভিজে মাটি পাইলে সে সচ্ছন্দে

---

* Struggle for Existence.

বাঁচিতে পারে, তার উপর তার জীবন নির্ভর করিতেছে। কিন্তু আমরা বলি কি? যে সে জলকষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছে। বনের মধ্যে অনেক গাছ। কোন গাছে অনেক ফল হয়, কিন্তু ধরিয়া লও, গড়ে তার একটী মাত্র বীজ সুপক্ক হইয়া চারা উৎপাদন করিল। এখানে বলিতে হইবে যে, সেই গাছ বনের স্বজাতীয় এবং অন্যান্য গাছেদের সঙ্গে জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এমন অনেক কীট আছে, যাহারা গাছের পাতা খাইয়া বাঁচে—মনে কর যেমন গুটি পোকা। হয় কুলপাতা, নয় কাঠবাদামের পাতা কিম্বা ভেরেন্দার পাতা তাহাদের খাদ্য। এস্থলে গুটি পোকার জীবন সেই সেই গাছের উপর নির্ভর করিতেছে। কিন্তু দূর অর্থে বলা যাইতে পারে যে, তাহারা গাছেদের সঙ্গে জীবনের যুদ্ধ করিতেছে; কেন না বেশী পোকা জন্মিয়া যদি গাছের সব পাতা খাইয়া ফেলিয়া তাহাকে বাড়িতে না দেয়, তবে তাহার বাঁচা ভার। আবার একটী মাত্র শাখায় যদি কতক গুলা পোকা এক সঙ্গে বাস করে, তাহা হইলে স্থানাধিকার এবং আহার্য্য পাতা সংগ্রহ লইয়া তাহাদের মধ্যে গুরুতর জীবন-সংগ্রাম উপস্থিত হইবে।

যে কয়টী উদাহরণ দেওয়া হইল, তাহা বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, জীবন সংগ্রাম কথাটা নানার্থ বাচক। সুবিধার জন্য এক কথায় নাম দেওয়া হইয়াছে—জীবন-সংগ্রাম।

জীবন-সংগ্রাম জীব বৃদ্ধির অনিবার্য্য ফল। সংসারের জীব প্রবাহ এমনি বাড়িয়া চলিয়াছে যে, মৃত্যু মহামারী প্রভৃতি ছাড়িয়া দিলেও যাহা বাঁচিয়া থাকে, তাহার সকলই যদি টিকিতে পারিত, তবে কয় বৎসর মধ্যে এই বিপুলা ধরিত্রী বক্ষে ঠাঁই মাত্র থাকিত না। কাজেই এক ব্যক্তির সঙ্গে অন্যের, এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির অথবা জীব-নোপায় প্রভৃতির সঙ্গে তাহার বা তাহাদের সঙ্ঘর্ষ এবং সংগ্রাম হইবেই হইবে। অর্থনীতির আচার্য্য ম্যালথাস্ বলিয়া গিয়াছেন যে, যে পরিমাণে মানুষ বাড়ে, খাদ্য সামগ্রী সে পরিমাণে বাড়ে না, অতএব মনুষ্যসমাজের সকল বিপত্তির উপর বিপত্তি যে গুরুতর দারিদ্র, তাহার উত্তরোত্তর প্রভাব দমন করিয়া সমাজ রক্ষা করিতে হইলে আমাদিগকে যথেচ্ছ বিবাহ বন্ধ, আর উপনিবেশ স্থাপন করিতে হইবে। জীবন-সংগ্রাম প্রকৃতি রাণীর কেজো মন্ত্রী ম্যালথস্, স্থধু কথায় পরামর্শ না দিয়া অনন্ত বলে আপন মনে কাজ করিয়া যাইতেছেন। তিনি আছেন বলিয়াই রক্ষা, নহিলে রাজ্ঞী প্রকৃতি যে রকম বেহিসাবি জীবনের বস্তার রাশি আমদানি করান, তাহা রাখার স্থান হইত না।

বাস্তবিক জীব প্রবাহের ভয়ানক বৃদ্ধির কথা ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। জীব মাত্রেই এই বৃদ্ধিপ্রবণ, এ নিয়মের ব্যভিচার নাই। এমনি ব্যাপার যে, এক দম্পতির সন্ততি সবগুলি যদি বাঁচিয়া যায়, তবে তাহারাই সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত করিতে পারে। মানুষ সকলের চেয়ে কম বাড়ে; হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে, গড়ে পঁচিশ বৎসরে তাহার সংখ্যা দ্বিগুণ হয়। এই হিসাবে অব্যাহত গতিতে বাড়িতে পারিলে হাজার বৎস-

রের কম সময়ে মানুষেরই এ পৃথিবীতে স্থান হয় না। কোন গাছেই বৎসর বৎসর দুইটার কম বীজ উৎপন্ন হয় না—কিন্তু লিনেয়াস্ (Linnæus) হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, ঐ ঐ বীজের গাছ আবার তাদের বীজের গাছ, এমনি যদি ক্রমাগত বিশ বছর চলিয়া যায়, তাহা হইলে দশ হাজার গাছ ঐ সময় মধ্যে উৎপন্ন হইবে। সকল জীবের মধ্যে হস্তীর সন্তানভাগ্যটা বড় মন্দ। পরমায়ু এক শত বৎসর, কিন্তু ত্রিশ বৎসরের সময় আরম্ভ হইয়া উহার সন্তানোৎপাদিকাশক্তি নব্বই বৎসরের মধ্যেই তিরোহিত হয়। এই ষাইট বৎসরে ঊর্দ্ধ সংখ্যা তাহার ছয়টী মাত্র শাবক জন্মে। এই হিসাবে স্থির করা যায় যে, ৭৪০ কি সাড়ে সাত শত বৎসরে নয় শত লক্ষ হস্তী জন্মিতে পারে।

কিন্তু এ ত গেল আন্দাজি হিসাব। দক্ষিণ আমেরিকায় এবং ইদানীং অষ্ট্রেলিয়া প্রদেশে ঘোড়া ও গোরু প্রভৃতির বৃদ্ধি এত বিস্ময়কর যে, তাহাদের জন্মহিসাব খুব ভাল করিয়া রক্ষিত বলিয়াই বিশ্বাস করা যাইতে পারে। গাছ পালা সম্বন্ধেও সেই কথা। অনেক দ্বীপে নূতন কোন গাছ রোপণ করিয়া দেখা গিয়াছে, দশ বৎসরে তাহারা সর্ব্বত্র দখল করিয়া বসিয়া আছে। এদেশে লালভেরেন্দার গাছ পূর্ব্বে ছিল না, শুনা যায় আমেরিকা হইতে আসিয়াছে। কথা সত্য হইলে বলিতে হইবে যে, "নব অভ্যুদয়," "নব বীর্য্য বলে অধীর হইয়া পৃথিবী গ্রাসিতে" যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়া থাকুন না, ভারতবর্ষের দিকে তিনি অমোঘ অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন। কেন না এই লাল ভেরেন্দার বিচিত্র বৃক্ষরাজি বিশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে সুখের রাজত্ব স্থাপন করিয়াছে। আরও উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

ইহার অর্থ কি? কেহ মনে করিবেন না বোধ হয় যে, জীব এবং উদ্ভিদের এই বিষম উৎপাদিকা শক্তি কিছু দিনের জন্য হঠাৎ বড়িয়া গেছে। আসল কথা, যে অবস্থায় তাহারা পড়িয়াছে, তাহা জীবন ধারণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, সুতরাং তাহাদের মধ্যে অকাল মৃত্যুও বড় একটা ঘটিতে পায় নাই।

---

# বরফ পড়া।

## ( দৃশ্য )

ছবির রেখা মন হইতে কেমন অল্পে অল্পে অস্পষ্ট হইয়া আসে; প্রতিদিন যে সকল জিনিষ দেখি, তাহাদেরই ছায়া অগ্রবর্ত্তী হইয়া মনের মধ্যে ভিড় করিয়া দাঁড়ায়, কিছু দিন আগে যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহাদের প্রতিবিম্ব গোলেমালে কোথায় মিলাইয়া যায়, ভাল করিয়া ঠাহর করিবার যো থাকে না।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে আমি ইংলণ্ডে যাই, সে আজ সাত বৎসর হইল। তখন আমার বয়সও নিতান্ত অল্প ছিল। তখন ইংলণ্ডে যাহা দেখিয়াছিলাম তাহার একটা মোটামুটি ভাব মনে আছে বটে, কিন্তু তাহার সকল ছবি খুব পরিষ্কাররূপে মনে আনিতে পারি না, রেখায় রেখায় মিলাইয়া লইতে পারি না। ইহারই মধ্যে আমার স্মৃতিপটবর্ত্তী ইংলণ্ডের উপর কোয়াশা পড়িয়া আসিতেছে। ছবিগুলি মাঝে মাঝে রৌদ্রে বাহির করিয়া ঝাড়িয়া দেখিতে হয়। সেই জন্য আজ স্মৃতিপট রৌদ্রে বাহির করিয়াছি।

আমি যখন ইংলণ্ডে গিয়া পৌঁছাই, তখন অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি। তখনও খুব বেশী শীত বলিয়া আমার মনে হয় নাই। আমরা ব্রাইটনে ছিলাম। ব্রাইটনে তখনও যথেষ্ট রৌদ্র ছিল। রৌদ্রে পুলকিত হইয়া সমুদ্রের ধারের পথে ছেলে বুড়া ঝাঁকে ঝাঁকে বাহির হইয়াছে। রোগীরা এবং জরাগ্রস্তরা ঠেলাগাড়িতে চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে পাশে পাশে একটি দুইটি মেয়ে, বা পরিবারের কেহ। মেয়েরা নানা সাজ-পরা, ছাতা মাথায়। ছোট ছেলেরা লোহার চাকা গড়াইয়া পথে ছুটিতেছে। সমুদ্রের তীরে কোন মেয়ে ছাতা মাথায় দিয়া বসিয়া। সমুদ্রের ঢেউয়ের অনুসরণ করিয়া কেহ কেহ নানাবিধ ঝিনুক সংগ্রহ করিতেছে। ইটালীয় ভিক্ষুক পথে পথে আর্গিন্ বাজাইয়া ফিরিতেছে। শাক সব্জিওয়ালা, দুধওয়ালা, গাড়ি করিয়া ঘরে ঘরে যোগান্ দিয়া ফিরি-তেছে। বেড়াইবার পথে অশ্বারোহী এবং অশ্বারোহিনী পাশাপাশি ছুটিয়াছে—পশ্চাতে কিছুদূরে একটি করিয়া অশ্বারোহী সহিস্ তক্‌মা পরিয়া অনুসরণ করিতেছে। এক-একটি শিক্ষক তাহার পশ্চাতে এক পাল ইস্কুলের ছেলে লইয়া—অথবা একেকটি শিক্ষয়িত্রী ঝাঁকে ঝাঁকে ইস্কুলের মেয়ে লইয়া সার বাঁধিয়া সমুদ্রতীরের পথে হাওয়া খাইতে আসিয়াছে; হাওয়া না হউক্—রৌদ্র খাইতে আসিয়াছে। আমরা প্রায় মাঝে মাঝে ছেলেদের লইয়া সমুদ্র তীরের তৃণক্ষেত্রে ছুটাছুটি করিতাম। ছুটাছুটি করিবার ঠিক বয়স নয় বটে—কিন্তু সেখানে আমাদের এই রীতি-বহির্ভূত ব্যবহার সমালোচনা করিবার যোগ্যপাত্র কেহ উপস্থিত ছিলেন না। দশটা এগারোটার সময় আমাদের বেড়াইবার সময় ছিল! যাহা হউক, আমরা যখন ব্রাইটনে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন সমুদ্রতীরে সূর্য্যকরোৎসব।

দিন যাইতে লাগিল—শীত বাড়িতে লাগিল। রাস্তার কাদা শীতে শক্ত হইয়া উঠিল। ঘাসের উপরে শিশির জমিয়া যাইত, কে যেন চূন ছড়াইয়াছে। সকালে উঠিয়া দেখি শার্শির কাঁচে চিত্র বিচিত্র তুষারের স্ফটিকলতা আঁকা রহিয়াছে। কখন কখন পথে দেখিতাম, দুই একটা চড়ুই পাখী শীতে মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। গাছের যে কয়েক্‌টা হলুদে পাতা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও ঝরিয়া পড়িল, শীর্ণ ডাল গুলো বাহির হইতে লাগিল। বিশ্বস্ত হৃদয় ছোট ছোট রবিন্ পাখী কাঁচের জানলার কাছে আসিয়া রুটির টুক্‌রা ভিক্ষা চায়। সকলে আশ্বাস দিল, শীঘ্রই বরফ পড়া দেখিতে পাইবে।

ক্রীষ্ট্‌মাসের সময় আগত প্রায়। কন্‌কনে শীত। জ্যোৎস্না রাত্রি। ঘরের জানলা দরজা বন্ধ, পরদা ফেলা। গ্যাস জ্বলিতেছে। গরমের জন্য আগুন জ্বালা হইয়াছে। সন্ধ্যা-বেলা আহার করিয়া অগ্নিকুণ্ড ঘিরিয়া আমরা গল্পে নিমগ্ন। দুটি ছেলে আমার প্রতি আক্রমণ করিয়াছেন। তাঁহারা যে আমার সঙ্গে ভদ্রজনোচিত ব্যবহার করিতেন না, তাহার সহস্র প্রমাণ সত্ত্বেও আমি এখানে সে সকল কথার উল্লেখ করিতে চাহি না। তাহারা এখন বড় হইয়া উঠিয়াছে, "বালক" পড়িয়া থাকে—তাহাদের সম্বন্ধে একটা কথা লিখিয়া শেষ কালে জবাবদিহি করিতেই প্রাণ বাহির হইয়া যায়। আর কিছু দিন পরে তাহারা আবার প্রতিবাদ করিতেও শিখিবে। তখন আমি তাহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিব না—এই ভয়ে আমি ক্ষান্ত রহিলাম; পাঠকেরা তাহাদের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে যাহার যেমন সাধ্য অনুমান করিয়া লইবেন—আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক কোনরূপ দায় স্কন্ধে লইতে চাই না।

গরম হইয়া সকলে বসিয়া আছি, এমন সময়ে খবর আসিল, বরফ পড়িয়াছে। কখন্ পড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল, জানিতে পারি নাই, আমাদের দ্বার সমস্ত রুদ্ধ ছিল। ছেলে-পিলে মিলিয়া লাফালাফি করিয়া বাহিরে গিয়া দেখি—কি চমৎকার দৃশ্য! শীতে জ্যোৎস্না স্তর যেন জমিয়া জমিয়া, রাস্তায়, ঘাসের উপর, গাছের শূন্য ডালে, গড়ানো স্লেটের ছাতে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। পথে লোক নাই। আমাদের সমুখের গৃহ-শ্রেণীর জান্‌লা দরজা সমস্ত বন্ধ। সেই রাত্রি ও নির্জ্জনতা, জ্যোৎস্না ও বরফ সমস্ত মিলিয়া কেমন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য সৃজন করিয়াছিল! ছেলেরা (এবং আমিও) ঘাসের উপর হইতে বরফ কুড়াইয়া পাকাইয়া গোলা করিতেছিল। সেগুলো ঘরে আনিতেই ঘরের তাতে গলিয়া জল হইয়া যাইতে লাগিল।

আমার পক্ষে এই প্রথম বরফপড়া রাত্রি। ইহার পরে আরও অনেক বরফ পড়া দেখিয়াছি। কিন্তু তাহার বর্ণনা করা সহজ নহে—বিশেষতঃ এত দিন পরে। সর্ব্বাঙ্গ কালো গরম কাপড়ে আচ্ছন্ন; রাস্তা দিয়া চলিয়াছি। আকাশ ধূসর বর্ণ। গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ কুইনাইনের গুঁড়ার মত চারিদিকে পড়িতেছে। বৃষ্টির মত টপ্‌টপ্ করিয়া পড়ে না—লঘু চরণে উড়িয়া উড়িয়া নাচিয়া নাচিয়া পড়ে। কাপড়ের উপরে আসিয়া ছুঁইয়া থাকে, ঝাড়িলেই পড়িয়া যায়। চারিদিক শুভ্র। কোমল বরফের স্তরের উপর গাড়ির চাকার দাগ পড়িয়া যাইতেছে। শুভ্র বরফের আস্তরণের উপরে কাদাসুদ্ধ জুতার পদ-চিহ্ন ফেলিতে কেমন মায়া হয়। মনে হয়, স্বর্গ হইতে যেন ফুলের পাপ্‌ড়ি, যেন পারিজাতের কেশর ঝরিয়া পড়িতেছে। পথিকদের কালো কাপড়ে কালো ছাতায় বরফ লাগিয়াছে।

কেমন অল্পে অল্পে সমস্ত বরফে আচ্ছন্ন হইয়া আসে! প্রথমে পথে ঘাটে শাদা শাদা রেখা-রেখার মত পড়িতে লাগিল। আমাদের বাড়ির সমুখেই অল্প একটুখানি জমি

আছে, তাহাতে খানকতক গাছের চারা ও গুল্ম আছে—গাছে পাতা নাই, কেবল ডাঁটা সার; সেই ডাঁটাগুলি এখনও আচ্ছন্ন হয় নাই—সবুজে শাদায় মেশামেশি হইতেছে। গাছের চারাগুলো যেন শীতে হীহি করিতেছে। তাহাদের গাত্রবস্ত্র গিয়াছে, বরফের শাদা শোক-উত্তরীয় পরিয়া তাহাদের শিরার ভিতরকার রস যেন জমিয়া যাইতেছে। বাড়ির কালো স্লেটের চাল অল্প অল্প পাণ্ডুবর্ণ হইয়া ক্রমে শাদা হইয়া উঠিতেছে। ক্রমে পথ আচ্ছন্ন হইয়া গেল—ছোট ছোট চারা বরফে ডুবিয়া গেল। জানলার সম্মুখে সঙ্কীর্ণ আলিসার উপরে বরফের স্তর উঁচু হইয়া উঠিতে লাগিল। যে দুই একজন পথিক দেখা যায়, তাহাদের নাক নীল হইয়া গিয়াছে, মুখ শীতে সঙ্কুচিত। অদূরে গির্জ্জার চূড়া শ্বেতবসন প্রেতের মত আকাশে আবছায়া দেখা যাইতেছে।

শীত যে কতখানি তাহা এই ভাদ্রমাসের গুমটে কল্পনা করা বড় শক্ত। মনে আছে, সকালে ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া হাত এমন অসাড় হইয়া যাইত যে, পকেটে রুমাল খুঁজিয়া পাইতাম না। গায়ে গরম কাপড়ের সীমা পরিসীমা নাই—মোটা জুতো ও মোটা মোজার মধ্যে পায়ের তেলো ছটো কথায় কথায় হিম হইয়া উঠিত। রাত্রে কম্বলের বস্তার মধ্যে প্রবেশ করিয়াও পাশ ফিরিতে নিতান্ত ভাবনা উপস্থিত হইত, কারণ, যেখানে ফিরিব সেইখানেই ছ্যাক্ করিয়া উঠিবে। শুনা গেল, এক্‌টা জেলে-নৌকায় চার জন জেলে সমুদ্রে মাছ ধরিতে গিয়াছিল, কোন জাহাজের কাছে আসিতে জাহাজের লোকেরা দেখিল, তাহারা চার জনেই শীতে জমিয়া মরিয়া আছে। রাত্রে গাড়ির উপরে গাড়ির কোচমান্ মরিয়া আছে। জলের নলের মধ্যে জল জমিয়া মাঝে মাঝে নল ফাটিয়া যায়। টেম্‌স্ নদীর উপরে বরফ জমিয়াছে। হাইড্ পার্ক নামক উদ্যানের ঝিল্ জমিয়া গেছে। প্রতিদিন শত সহস্র লোক একপ্রকার লৌহ-পাদুকা পরিয়া সেই ঝিলের উপর স্কেট্ করিতে সমাগত।

এই স্কেট্ করা এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। কঠিন জলাশয়ের উপর শত সহস্র লোক স্কেট্‌জুতা পরিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া হেলিয়া ছুলিয়া পিছলিয়া চলিতেছে। পালে নৌকা চলা যেমন, স্কেটে মানুষ চলাও তেম্‌নি—শরীর ঈষৎ হেলাইয়া মাটির উপর দিয়া কেমন অবলীলাক্রমে ভাসিয়া যাওয়া যায়। পদক্ষেপ করিবার পরিশ্রম নাই—মাটির সহিত বিবাদ করিয়া, পদাঘাতের দ্বারা প্রতিপদে মাটিকে পরাভূত করিয়া চলিতে হয় না।

কিন্তু কল্পনা যোগে আমাদের দেশে সেই বিলাতের শীত আমদানী করিবার চেষ্টা করা বৃথা—আমাদের এখানকার উত্তাপে তাহা দেখিতে দেখিতে তাতিয়া উঠে, বরফের মত গলিয়া যায়, তাহাকে আয়ত্ত করা যায় না। আমাদের এখানকার লেপ কাঁথার মধ্যে তাহার যথেষ্ট সমাদর হয় না।

---

# বাব্‌লা গাছের কথা।

কুসুম, মা আমার, আজি তুই কোথায়? মাগো দেখে যা আজি তোর স্নেহের সাধের বাব্‌লা গাছের কি দশা হয়েছে! মা সেই যে তুই রোজ সূর্য্যদেব দেখা না দিতেই ঐ ঘরের দুয়ারটী ধীরে ধীরে খুলিয়া তোর কচি কচি হাত দুখানিতে জলের ঝারি ধরিয়া আমাকে রোজ প্রাতস্নান করাইয়া দিতিস্, সেইরূপ ভোরের বেলায় উঠিয়া এখন তুই কোথায় আর কাহাকে তোর স্নেহ বারিতে সিঞ্চন করিস্! মা সেই যে তুই পাঁচ-বছরের মেয়েটী একদিন সাধ করিয়া তোর কচি হাত দুখানি দিয়া একটা বাব্‌লাগাছ রোপণ করিয়াছিলি, সে হাত দুখানি আজ কোথায় কোন গাছগুলিকে সেইরূপ সাধ করিয়া রোপিতেছে! মা আমার, সেই যে তুই প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় আমার তলে বসিয়া তোর সুখের দুঃখের কত কথাই আমাকে শুনাইতিস্—তোর মায়ের কথা, তোর বুড় ঝিএর কথা তোর পুতুলের কথা, আরও কত কথাই আমাকে বলিতিস্, সে সব কি আমি ভুলিয়াছি মা? কুসুম সেই যে তুই আমার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে আমার অন্য ফুলগুলির মধ্যে মাথা তুলিয়া ফুটিয়া থাকিতিস্, আমার সেই সাধের কুসুমকে আজি কে ছিন্ন করিয়া লইল! মা সেই যে তোর মাতা এ লোক হইতে অপসৃত হইলে এই আমার তলে বসিয়া কত কাঁদিয়াছিলি, বলিয়াছিলি, "বাব্‌লা আমার, আজ তুমি ছাড়া আমার আর কেহ রহিল না।" আমাকে তুই ভাল বাসিস্ মা! যে বাব্‌লা গাছের কাঁটার ভয়ে সকলে দশ হাত দূরে দূরে থাকে, সেই কাঁটা গাছকে তুই তোর হৃদয়ের ভিতরে অতি সযত্নে রাখিতে চাস্, পাছে আবার তোর মাতার ন্যায় তাহাকেও বা কেহ চুরি করিয়া লয়!

কুসুম, এখন একবার এদিকে চোখ মেলিয়া দেখ মা। দেখ্ তোর সেই সাধের কুটীর, যেখানে তোর মায়ের সহিত কত গল্পই করিয়াছিস, মায়ের কত আদরই পাইয়াছিস্, মাকে কত আদরই করিয়াছিস, সেই কুটীরের আজ কি দশা! দেখ মা আজি সে কুটীরে একটী চিহ্ন মাত্র নাই, তাহার স্থানে এক বৃহৎ অট্টালিকা। সেই, যে ছোট কুটীরটীর হইতে তুই তোর কচি মুখটী বাড়াইয়া আমার দিকে চাহিয়া আমাকে কত আদরের নামে ডাকিতিস্, দেখ্ আজ তাহার পরিবর্ত্তে ঐ অট্টালিকার প্রকাণ্ড দুইটা গবাক্ষ হইতে কত অচেনা মুখ আমার দিকে চাহিয়া দিন-দুপুরে আমাকে গালি দিতেছে। দেখ্ মা, যে বাব্‌লাকে তুই তোদের কুটীরের সম্মুখে স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিলি, যাহাতে তুই স্বহস্তে রোজ বারি সিঞ্চন করিতিস্, দেখ্ তোর সে আদরের ধন বাব্‌লা আজি তোর স্নেহবারি অভাবে মৃত প্রায়, দেখ মা আজ তোর সন্তানকে আর কেহ একবার আদর করিয়া ডাকেনা, কেহ আর তাহার প্রতি একবার স্নেহচক্ষে চায় না; তুই থাকিতে যে বাব্‌লাকে কেহ স্পর্শ করিতেও পারিত না, আজি দেখ, সকলে

রোজই তাহার ডালপালা কাটিয়া তাহার ফুলগুলিকে পায়ে দলিয়া তাহাকে বিকলাঙ্গ করিয়া চলিয়া যাইতেছে!

কুসুম এখান হইতে যাইবার দিন তুই প্রাণ ভরিয়া শেষবার আমাকে স্নান করাইয়াছিলি। সে দিন তুই শুদ্ধ তোর ঝারির জলে আমাকে স্নান করাস্ নাই, সেদিন তোর চখের জলে ঝারির জলে দুয়ে মিশিয়াছিল। সেদিন তুই বিকালে যাইবার সময় কতবার আমার দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিয়া চাহিয়া গিয়াছিলি, বুঝি আমার ন্যায় তোরও আমাকে ছাড়িয়া যাইতে বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। কুসুম, সে চাহনি দশ বৎসরের বালিকার চাহনি নহে, সে মাতার স্নেহের চাহনি। সে চাহনি কি জীবনে কখন ভুলিব কুসুম! মাতার সে স্নেহময় চাহনি সন্তান কি কখন ভুলিতে পারে!

মা, এখন যে আমি প্রতিদিন তোর জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকি। তুই যে যাইবার সময় আমার কানে কানে বলিয়া গিয়াছিলি "বাবুলাটি আমার, তুমি কিছু কষ্ট করনা, আমি আবার মামাকে বলে শীঘ্রই আস্‌ব।" কুসুম সে কথাগুলি যে আমার কর্ণে সুধা ঢালিয়া দিয়াছিল। কই কুসুম, কিন্তু তুইত এখনও তোর কথা পালন করিলি না! তুই বলিয়াছিলি—শীঘ্র আসিব। কুসুম কোথায় তুই আসিলি? এতদিন হইয়া গেল তবুত তুই আমাকে একবার মনেও করিলি না! কুসুম, মা আমার, এখানেত তোর কথা কাহারও মুখে শুনিতে পাই না! আমার পাশ দিয়া কত লোক যাতায়াত করে, তাহারা আর সকল কথাই বলে, কিন্তু কুসুমের কথা ত বলে না!

কুসুম, দেখ আবার বুঝি কে আমার ডালপালা কাটিতে আসিয়াছে, আমার ফুলগুলি পায়ে দলিতে আসিয়াছে। ঐ দেখ্ সে আসিয়া একটী একটী করিয়া আমার ফুল তুলিতেছে। কিন্তু এ কি! এ যে অতি যত্নের সহিত তুলিয়া অতি যত্নের সহিত তাহার অঞ্চলে রাখিতেছে! এ কে? এ ত আমার কুসুম নয়? তবে একে আবার আমার ফুলগুলি যত্ন করিতে কে শিখাইল?

এ কাহার নাম শুনিলাম? যে নাম অনেক দিন কাহারও মুখে শুনি নাই, যে নাম একটীবার কাহারও মুখে শুনিবার জন্য কত না কষ্ট করিয়াছি, যে নাম আমার হৃদয়ের মধ্যে জাগ্রতে স্বপনে সকল সময়েই শুনিতে পাই, এ যে সেই নাম! আবার এ কি কথা? মা আমাকে তবে তুই ভুলিস্ নাই? আমার ফুল চাহিয়া পাঠাইয়াছিল্? মা আমার যে ইচ্ছা করিতেছে, আগে যেমন তোর মাথার উপরে, কোলের উপরে টুপ্‌টাপ্ করিয়া ফুল ফেলিতাম আজ তেমনি নিজে যাইয়া তোর চরণতলে সব ফুলগুলি ঢালিয়া দিয়া আসি, আমার হৃদয়ের স্নেহের ভার লাঘব করিয়া আসি!

---

# শিখ স্বাধীনতা।

গুরু গোবিন্দই শিখদিগের শেষ গুরু। তিনি মরিবার সময় বন্দা নামক এক বৈরাগীর উপরে শিখদিগের কর্তৃত্বভার দিয়া যান। তিনি যে সঙ্কল্প অসম্পূর্ণ রাখিয়া যান, সেই সঙ্কল্প পূর্ণ করিবার ভার বন্দার উপরে পড়িল। অত্যাচারী বিদেশীদের হাত হইতে স্বজাতিকে পরিত্রাণ করা গোবিন্দের এক ব্রত ছিল, সেই ব্রত বন্দা গ্রহণ করিলেন।

বন্দার চতুর্দ্দিকে শিখেরা সমবেত হইতে লাগিল। বন্দার প্রতাপে সমস্ত পঞ্জাব কম্পিত হইয়া উঠিল। বন্দা সির্হিন্দ হইতে মোগলদের তাড়াইয়া দিলেন, সেখানকার শাসনকর্ত্তাকে বধ করিলেন। সির্মুরে তিনি এক দুর্গ স্থাপন করিলেন। শতদ্রু এবং যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ অধিকার করিয়া লইলেন, এবং জিলা সাহারাণপুর মরুভূমি করিয়া দিলেন।

মুসলমানদের সঙ্গে মাঝে মাঝে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। লাহোরের উত্তরে জম্বু পর্ব্বতের উপরে বন্দা নিবাস স্থাপন করিলেন, পঞ্জাবের অধিকাংশই তাঁহার আয়ত্ত হইল।

এই সময়ে দিল্লির সম্রাট বাহাদুর সার মৃত্যু হইল। তাঁহার সিংহাসন লইয়া তাঁহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে গোলযোগ চলিতে লাগিল। এই সুযোগে শিখেরা সমবেত হইয়া বিপাশা ও ইরাবতীর মধ্যে গুরুদাসপুর নামক এক বৃহৎ দুর্গ স্থাপন করিল।

লাহোরের শাসনকর্ত্তা বন্দার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে মুসলমানদের জয় হইল। এই জয়ের পর সির্হিন্দে এক দল শিখসৈন্য পুনর্ব্বার প্রেরিত হইল। সেখানকার শাসনকর্ত্তা বয়াজিদ্ খাঁ শিখদিগকে আক্রমণ করিলেন। একজন শিখ গোপনে বয়াজিদের তাম্বুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নিহত করিল। দিল্লির সম্রাট কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা আবদুল সম্মদ খাঁ নামক এক পরাক্রান্ত তুরাণীকে শিখদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। দিল্লি হইতে তাঁহার সাহায্যার্থে একদল বাছা বাছা সৈন্য প্রেরিত হইল। সম্মদ্ খাঁও সহস্র সহস্র স্বজাতীয় তুরাণী সৈন্য লইয়া যাত্রা করিলেন। লাহোর হইতে কামান শ্রেণী সংগ্রহ করিয়া তিনি শিখদিগের উপরে গিয়া পড়িলেন। শিখেরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিল। আক্রমণকারীদের বিস্তর সৈন্য নষ্ট হইল। কিন্তু অবশেষে পরাজিত হইয়া বন্দা গুরুদাসপুরের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শত্রুসৈন্য তাঁহার দুর্গ সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া ফেলিল। দুর্গে খাদ্য যাতায়াত বন্ধ হইল। সমস্ত খাদ্য এবং অখাদ্য পর্য্যন্ত যখন নিঃশেষ হইয়া গেল, তখন বন্দা শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। ৭৪০ জন শিখ বন্দী হইল। কথিত আছে যখন বন্দীগণ লাহোরের পথ দিয়া যাইতেছিল তখন বয়াজিদ্ খাঁর বৃদ্ধা মাতা তাহার পুত্রের হত্যাকারীর মস্তকে পাথর ফেলিয়া দিয়া বধ করিয়াছিল। বন্দা যখন

দিল্লিতে নীত হইলেন, তখন শত্রুরা শিখদের ছিন্নশির বর্ষাফলকে করিয়া তাঁহার আগে আগে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। প্রতিদিন একশত করিয়া শিখ বন্দী বধ করা হইত। একজন মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে "শিখেরা মরিবার সময় কিছু মাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করে নাই—কিন্তু অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আগে মরিবার জন্য তাহারা আপনা-আপনির মধ্যে বিবাদ ও তর্ক করিত। এমন কি, এই জন্য তাহারা ঘাতকের সঙ্গে ভাব করিবার চেষ্টা করিত।" অষ্টম দিনে বন্দা বিচারকের সমক্ষে আনীত হইলেন। একজন মুসলমান আমীর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এমন বুদ্ধিমান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও এত পাপাচরণে তোমার মতি হইল কি করিয়া?" বন্দা বলিলেন "পাপীর শাস্তিবিধানের জন্য ঈশ্বর আমাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের আদেশের বিরুদ্ধে যাহা কিছু কাজ করিয়াছি তাহার জন্য আবার আমারও শাস্তি হইতেছে।" বিচারকের আদেশে তাঁহার ছেলেকে তাঁহার কোলে বসাইয়া দেওয়া হইল। তাঁহার হাতে ছুরি দিয়া স্বহস্তে নিজের ছেলেকে কাটিতে হুকুম হইল। অবিচলিত ভাবে নীরবে তাঁহার ক্রোড়স্থ ছেলেকে বন্দা বধ করিলেন। অবশেষে দগ্ধ লৌহের সাঁড়াশি দিয়া তাঁহার মাংস ছিঁড়িয়া তাঁহাকে বধ করা হইল।

বন্দার মৃত্যুর পর মোগলেরা শিখদের প্রতি নিদারুণ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। প্রত্যেক শিখের মাথার জন্য পুরস্কার স্বরূপ মূল্য ঘোষণা করা হইল।

শিখেরা জঙ্গলে ও দুর্গম স্থানে আশ্রয় লইল। প্রতি ছয় মাস অন্তর তাহারা একবার করিয়া অমৃতসরে সমবেত হইত। পথের মধ্যে যে সকল জমিদার ছিল তাহারা ইহাদিগকে পথের বিপদ হইতে রক্ষা করিত। এই ষাণ্মাসিক মিলনের পর আবার তাহারা জঙ্গলে ছড়াইয়া পড়িত।

পঞ্জাব জঙ্গলে আবৃত হইয়া উঠিল। নাদির সা আফগানিস্থান হইতে ভারতবর্ষে আসিবার সময় পঞ্জাব দিয়া আসিতেছিলেন। নাদির সা জিজ্ঞাসা করিলেন—শিখদের বাসস্থান কোথায়? পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা উত্তর করিলেন,—ঘোড়ার পৃষ্ঠের জিনই শিখদের বাসস্থান।

নাদির সাহের ভারত আক্রমণ কালে শিখেরা ছোট ছোট দল বাঁধিয়া তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী পারসীক সৈন্যদলকে আক্রমণ করিয়া লুটপাট করিতে লাগিল। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ বিগ্রহে রত হইয়া শিখেরা পুনশ্চ দুঃসাহসিক হইয়া উঠিল। এখন তাহারা প্রকাশ্যভাবে শিখতীর্থ অমৃতসরে যাতায়াত করিতে লাগিল। একজন মুসলমান লেখক বলেন—প্রায়ই দেখা যায়, অশ্বারোহী শিখ পূর্ণবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া তাহাদের তীর্থ উপলক্ষে চলিয়াছে। কখন কখন কেহ বা ধৃতও হইত, কেহ বা হতও হইত, কিন্তু কখনও এমন হয় নাই, যে, এক জন শিখ ভয়ে তাহার স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে। অবশেষে শিখেরা উত্তরোত্তর নির্ভীক হইয়া ইরাবতীর তীরে এক ক্ষুদ্র দুর্গ স্থাপন করিল।

ইহাতেও মুসলমানেরা বড় একটা মনোযোগ দিল না। কিন্তু তাহারা যখন বৃহৎ দল বাঁধিয়া আমিনাবাদের চতুষ্পার্শবর্ত্তী স্থানে কর আদায় করিতে সমবেত হইল, তখন মুসলমান সৈন্য তাহাদের আক্রমণ করিল। কিন্তু মুসলমানেরা পরাজিত হইল ও তাহাদের সেনাপতি বিনষ্ট হইল। মুসলমানেরা অধিক সংখ্যক সৈন্য লইয়া দ্বিতীয়বার আক্রমণ করিল ও শিখদিগকে পরাভূত করিল। লাহোরে এই উপলক্ষে বিস্তর শিখ বন্দী নিহত হয়। যেখানে এই বধকার্য্য সমাধা হয় লাহোরের সেই স্থান সুহিদগঞ্জ নামে অভিহিত। এখনো সেখানে ভাই তরু সিংহের কবরস্থান আছে। কথিত আছে, তরু সিংহকে তাঁহার দীর্ঘ কেশ ছেদন করিয়া শিখ ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বলা হয়। কিন্তু গুরুগোবিন্দের এই বৃদ্ধ অনুচর তাঁহার ধর্ম্মত্যাগ করিতে অসম্মত হইলেন এবং শিখদের শাস্ত্রানুমোদিত জাতীয় চিহ্ন স্বরূপ দীর্ঘ কেশ ছেদন করিতে রাজি হইলেন না। তিনি বলিলেন, "চুলের সঙ্গে খুলির সঙ্গে এবং খুলীর সঙ্গে মাথার সঙ্গে যোগ আছে। চুলে কাজ কি, আমি মাথাটা দিতেছি।"

এইরূপে ক্রমাগত জয়পরাজয়ের মধ্যে সমস্ত শিখ জাতি আন্দোলিত হইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই তাহারা নিরুদ্যম হইল না। এক সময়ে যখন তাহারা সির্হিন্দের শাসনকর্ত্তা জেইন খাঁর উপরে ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময়ে দুর্দ্দান্ত-পরাক্রম পাঠান আমেদ সা তাঁহার বৃহৎ সৈন্যদল সমেত তাহাদের উপর আসিয়া পড়িলেন। এই যুদ্ধে শিখদের সম্পূর্ণ পরাজয় হয়—তাহাদের বিস্তর লোক মারা যায়। আমেদ সা অমৃতসরের শিখ মন্দির ভাঙ্গিয়া দিলেন। গো-রক্ত ঢালিয়া অমৃতসরের সরোবর অপবিত্র করিয়া দিলেন। শিখদের ছিন্ন শির স্তূপাকার করিয়া সজ্জিত করিলেন। এবং কাফের শত্রুদের রক্তে মস্‌জিদের ভিত্তি ধৌত করিয়া দিলেন।

কিন্তু ইহাতেও শিখেরা নিরুদ্যম হইল না। প্রতিদিন তাহাদের দল বাড়িতে লাগিল। প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি সমস্ত জাতির হৃদয়ে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। প্রথমে তাহারা কসুর নামক পাঠানদের উপনিবেশ আক্রমণ, লুণ্ঠন ও গ্রহণ করিল। তাহার পরে তাহারা সির্হিন্দে অগ্রসর হইল। সেখানকার শাসনকর্ত্তা জেইন খাঁর সহিত যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে পাঠান পরাজিত ও নিহত হইল। শতদ্রু হইতে যমুনা পর্য্যন্ত সিরহিন্দ প্রদেশ শিখদের করতলস্থ হইল। লাহোরের শাসনকর্ত্তা কাবুলিমলকে শিখেরা দূর করিয়া দিল। ঝিলম হইতে শতদ্রু পর্য্যন্ত সমস্ত পঞ্জাব শিখদের হাতে আসিল। এই বিস্তৃত ভূখণ্ড সর্দ্দারেরা মিলিয়া ভাগ করিয়া লইলেন। শিখেরা বিস্তর মস্‌জিদ্ ভাঙ্গিয়া ফেলিল। শৃঙ্খলবদ্ধ আফগানদের দ্বারা শূকর রক্তে মস্‌জিদ্-ভিত্তি ধৌত করান হইল। সর্দ্দারেরা অমৃতসরে সম্মিলিত হইয়া আপনাদের প্রভাব প্রচার এবং শিখ মুদ্রা প্রচলিত করিলেন।

এত দিন পরে শিখেরা সম্পূর্ণ স্বাধীন হইল। গুরুগোবিন্দের উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণে

সকল হইল। তার পরে রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয়। তার পরে ব্রিটিশ সিংহের প্রতাপ। তার পরে ধীরে ধীরে সমস্ত ভারতবর্ষ লাল হইয়া গেল। রণজিতের বিখ্যাত ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইল। সে সকল কথা পরে হইবে।

---

# নূতন স্বরলিপি।

কিছু দিন হইল "পতাকা" পত্রিকাতে বালকে প্রকাশিত স্বরলিপি সম্বন্ধে যে প্রশংসা-বাক্য প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহাতে আমরা লেখকের নিকটে কৃতজ্ঞ আছি। কিন্তু এক স্থানে লেখক যে বলিয়াছেন য়ুরোপীয় Solfaing পদ্ধতি হইতে ঐ স্বরলিপি লওয়া হইয়াছে সে কথার প্রতিবাদ করিতে আমরা বাধ্য হইলাম।

আমাদের উত্তর এই যে, আমরা Solfaing পদ্ধতির Do re mi fa ইত্যাদি চিহ্নের অনুকরণে কিছু আর সা রে গা মা ইত্যাদি চিহ্ন ব্যবহার করি নাই—প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় সুরকে আমাদের দেশে সা রে গা বলে বলিয়াই আমরা সা রে গা মা প্রভৃতি স্বরচিহ্ন ব্যবহার করিয়াছি। আমরা যেমন k হইতে ক পাই নাই g হইতে গ পাই নাই সেইরূপ do হইতে সা পাই নাই, re হইতে রে পাই নাই ইহা বলা বাহুল্য। প্রাচীন কালে আমাদের দেশে এক প্রকার শাদাসিধে স্বরলিপি প্রচলিত ছিল তাহাতেও এইরূপ সা রে গা মা স্বরচিহ্ন স্বরূপে ব্যবহৃত হইত। এইত গেল স্বরচিহ্ন। তাহার পর আসিতেছে ছেদ চিহ্ন। আমাদের দেশের ছেদ চিহ্ন এক দাঁড়ি ও দুই দাঁড়ি। আমরা আমাদের স্বরলিপিতে তাহাই বলবৎ রাখিয়াছি।

আমাদের মাত্রাচিহ্নের এক প্রধান সুবিধা এই যে, তাহা দেখিবামাত্র লোকের চক্ষে সহজে ধরা পড়িবে যে, দুইমাত্রা একমাত্রার ঠিক দ্বিগুণ—কেন না দুইমাত্রা একমাত্রার দ্বিগুণ স্থান অধিকার করে। যথা, (–) একমাত্রা। (– –) দুইমাত্রা। (– – –) তিনমাত্রা ইত্যাদি। এইরূপ মাত্রা চিহ্ন চক্ষে দেখিবামাত্র দীর্ঘ হ্রস্বের ঠাহর পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে ইহা অল্প সুবিধা নহে।

Solfa পদ্ধতিতে কি রূপ চিহ্ন ব্যবহার হয় তাহা আমরা ভাল জানি না। পতাকার লেখক মহাশয় তাহা যদি ভাল রূপ বিবৃত করিয়া লিখিয়া দেন তবে আমাদের ও পাঠকদের উপকার হয়।

যাহাই হউক্, স্বরলিপি সহজবোধ্য করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। যদি আর কেহ স্বরলিপিকে আরও অধিক সহজবোধ্য করিতে পারেন তবে আমরা তাহা মাথায় করিয়া লইব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# বৈজ্ঞানিক সংবাদ।

আমরা ত জানিতাম, আমাদের দেশেই যত বিশ্বের মশা। শীতের দেশে মশার উৎপাৎ নাই। সে কথাটা ঠিক নহে। মেরু প্রদেশের আলাস্কা নামক শীতপ্রধান স্থানে মশার যেরূপ প্রাদুর্ভাব তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। একজন লিখিয়াছেন—এখানে পশুপক্ষী শিকার করা দায়, ঘন মশার ঝাঁক মেঘের মত উড়িয়া লক্ষ্য আচ্ছন্ন করে। কখন কখন মশায় সেখানকার কুকুর মারিয়া ফেলে। সোয়াট্কা সাহেব লিখিতেছেন যে, তিনি শুনিয়াছেন মশায় সেখানকার বৃহৎ ভল্লুককে মারিয়া ফেলিয়াছে। ভল্লুক মশাসমাচ্ছন্ন জলাপ্রদেশে গিয়া পড়িলে দাঁড়াইয়া দুই পা দিয়া মশার ঝাঁকের সহিত যুদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। মশার গায়ে তাঁহার বড় বড় নখের একটি আঁচড়ও পড়ে না, এবং মশাকে জড়াইয়া ধরিবারও কোন সুবিধা হইয়া উঠে না। অবশেষে মশার দংশনে অন্ধ হইয়া ভল্লুক পড়িয়া থাকে, ও না খাইতে পাইয়া মরিয়া যায়। শীতপ্রধান মেরুদেশে মশার যেমন প্রবল প্রতাপ এমন আর কোথাও নহে। জাহাজে করিয়া যাঁহারা মেরুদেশে ভ্রমণ করিতে যান তাঁহারা সকলেই এ কথা জানেন। যেখানে সেখানে জাহাজ থামে সেইখানেই মশার পাল আসিয়া জাহাজ আক্রমণ করে— জামার আস্তিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভয়ানক রক্ত শোষণ করিতে থাকে। জাহাজ হইতে নামিয়া দুইজন বীরপুরুষ শিকার করিতে গিয়াছিলেন। তাহার একজন জর্ম্মন্ সেনা। ইনি যুদ্ধের সময় অশ্বারোহণে বীরপরাক্রমে ফ্রান্স্ পর্য্যটন করিয়াছিলেন, কোন বিপদ হয় নাই; কিন্তু এখানে মশার উপদ্রবে ঘোড়া হইতে পড়িয়া খোঁড়া হইয়া যান। মশার জ্বালায় ঘোড়া এবং আরোহী এম্‌নি অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন যে আত্ম-সংযমন উভয়ের পক্ষেই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সৈন্য জাহাজে আসিয়া গল্প করিলেন,—"পেটের মধ্যে মশা যায়, নিশ্বাস টানি নাকে মশা ঢোকে, থু থু করিয়া মুখের মধ্য হইতে মশা ফেলিয়া দিতে হয়।" সে দেশে গ্রীষ্মকালে মশার উপদ্রব বরঞ্চ কিছু কম থাকে, কারণ পাখিরা আসিয়া অনেক মশা খাইয়া ফেলে। আমাদের দেশে এত পাখী আছে, মশাওত কম নাই!

---

জলে আগুন জ্বলিতে দেয় না এইরূপ সাধারণের ধারণা, কিন্তু সম্প্রতি বেকর সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, যদি কোন জিনিষ একেবারে শুকাইয়া ফেলা যাইতে পারে, তবে তাহা আর জ্বলে না। সম্পূর্ণ শুষ্ককাঠ জ্বলে না। কিন্তু ইহার পরীক্ষা করা শক্ত। কারণ চতুর্দ্দিকেই জলীয় পদার্থ আছে। বাতাসের মধ্যে জল আছে। গ্যাসে জল আছে। জলকে দূর করা দায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই জলীয়

পদার্থ না থাকিলে অতিশয় দাহ্যপদার্থও জ্বলিতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে জল জ্বালাইবার সহায়তা করে।

---

যুদ্ধে বন্দুকের গুলি কত যে বৃথা খরচ হয়, তাহার একটা হিসাব বাহির হইয়াছে। ফরাসী-প্রসীয় যুদ্ধে দেখা গিয়াছে এক একটি সৈন্য মারিতে ১২০০ গুলি খরচ হইয়াছে। সল্‌ফেরিনোর যুদ্ধে প্রত্যেক সৈন্য বধ করিতে ৪২০০ গুলি লাগিয়াছে।

---

অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন সমুদ্রের ন্যায় ভূপৃষ্ঠও ক্রমাগত তরঙ্গিত বিচলিত হই-তেছে; ভূপৃষ্ঠে জোয়ারভাঁটা খেলিতেছে। কোথাও বা বড় ঢেউ কোথাও বা ছোট ঢেউ উঠিতেছে। পৃথিবীর তরঙ্গসঙ্কুল দেশের মধ্যে জাপান একটি প্রধান স্থান। সেখানে ছোট বড় ঢেউ ক্রমাগত উত্থিত হইতেছে। আমাদের এখানে এতটা ঢেউ নাই, কিন্তু সম্পূর্ণ যে স্থির আছে তাহা নহে। সমুদ্রে দাঁড় ফেলিলে সমুদ্রের জল যেমন কাঁপিয়া উঠে, রাস্তা দিয়া গাড়ি প্রভৃতি চলিলে ভূতল তেমনি কাঁপিতে থাকে, ইহা সকলেই দেখি-য়াছেন। এই ভূ-তরঙ্গ সম্বন্ধে য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা সম্প্রতি পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন।

---

আহারান্বেষণ ও আত্মরক্ষার উদ্দেশে ছদ্মবেশ ধারণ কীট পতঙ্গের মধ্যে প্রচলিত আছে তাহা বোধ করি অনেকে জানেন। তাহা ছাড়া, ফুল, পত্র প্রভৃতির সহিত স্বাভা-বিক আকার সাদৃশ্য থাকাতেও অনেক পতঙ্গ আত্মরক্ষা ও খাদ্য সংগ্রহের সুবিধা করিয়া থাকে। একটা নীল প্রজাপতি ফুলে ফুলে মধু অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিল। পুষ্পস্তবকের মধ্যে একটি ঈষৎ শুষ্কপ্রায় ফুল দেখা যাইতেছিল, প্রজাপতি যেমন তাহাতে শুঁড় লাগাইয়াছে অমনি তাহার কাছে ধরা পড়িয়াছে। সে ফুল নহে সে একটি শাদা মাকড়ষা। কিন্তু এমন এক রকম করিয়া থাকে যাহাতে তাহাকে সহসা ফুল বলিয়া ভ্রম হয়।

---

টিক্‌টিকির কাটা লেজ যেমন নড়িতে থাকে, মাকড়ষার বিচ্ছিন্ন পাও তেমনি নড়িয়া থাকে। কোন শত্রু আসিয়া পা ধরিলে মাকড়ষা অনায়াসে পায়ের মায়া ত্যাগ করিয়া তাহার পা খসাইয়া ফেলে। দুই একটা পা গেলেও তাহাদের বড় একটা ক্ষতি হয় না— অনায়াসে ছুটিয়া চলে।

---

বিলাতের উদ্যানকারদের মধ্যে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, যেখানে বিলাতী বেগুনের গাছ রোপণ করা হয় সেখানে পোকা মাকড় আসিতে পারে না। যে গাছে পোকা ধরিবার সম্ভাবনা আছে তাহার চারি পাশে বিলাতি বেগুন রোপন করিয়া গাছকে রক্ষা করা যায়। এটা অনায়াসেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারা যায়।

---

পণ্ডিতবর টাইলর সাহেব বলেন—পরীক্ষা করিয়া দেখিলে উদ্ভিদদের কার্য্যেও কতকটা যেন স্বাধীন বুদ্ধির আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। বৃক্ষ নিতান্ত যে জড়যন্ত্রের মত কাজ করে তাহা নহে, কতকটা যেন বিচার বিবেচনা করিয়া চলে। টাইলর সাহেব এই বিষয় লইয়া অনেক বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তিনি বলেন কৃত্রিম বাধা স্থাপন করিলে গাছেরা তাহা নানা উপায়ে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করে, এমন কি নিজের সুবিধা অনুসারে পল্লব সংস্থানের বন্দোবস্ত পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। এ বিষয়ে তিনি অন্যান্য নানাবিধ প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া সম্প্রতি একটি বক্তৃতা দিয়াছেন।

---

ত্রিবাঙ্কুরের উপকূলে নারাকাল ও আলেপিতে যে বন্দর আছে, সেখানে সমুদ্র অতিশয় প্রশান্ত। চারিদিকে যখন ঝড় ঝঞ্ঝা উপপ্লব তখনও এ বন্দর দুটির শান্তিভঙ্গ হয় না। ইহার একটি কারণ আছে। ইংরাজিতে প্রাচীন কাল হইতে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে, যে ক্ষুব্ধ সমুদ্রে তেল ঢালিলে তাহা শান্ত হয়। অনেকে তাহা অমূলক মনে করিতেন। কিন্তু সম্প্রতি পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, বাস্তবিকই তেল ঢালিলে জলের ঢেউ থামিয়া যায়। কিছু দিন হইল একটি প্রস্তাব পাঠ করিয়াছিলাম তাহাতে প্রত্যেক জাহাজে প্রচুর পরিমাণে তৈল রাখিতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল; ঝড়ের সময় অল্পে অল্পে সেই তৈল জাহাজের দুই পার্শ্বে ঢালিতে হইবে। নারাকাল এবং আলেপি বন্দরের সমুদ্রতল হইতে ক্রমাগত পেট্রোলিয়ম তৈল উত্থিত হইতেছে। কালিফর্ণিয়া তীরের নিকটবর্ত্তী একস্থানের সমুদ্রে এইরূপ তৈল-উৎস আছে। সেখানকার সমুদ্রও শান্ত থাকে।

---

আমেরিকায় শিল্পী ও মজুরদের মধ্যেও বহুল পরিমাণে বিদ্যাচর্চ্চা প্রচলিত আছে। এই জন্য সেখানকার হাতের কাজ অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্‌সে দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার আট শত প্রকাশ্য বিদ্যালয় আছে, অর্থাৎ প্রত্যেক দুইশ লোকের মধ্যে একটি করিয়া বিদ্যালয় আছে। একমাত্র মাসচুসেট্‌স্ প্রদেশে দুই হাজার পুস্তকালয় আছে, অর্থাৎ প্রত্যেক আট শত লোকের মধ্যে একটি করিয়া পুস্তকালয় আছে। অনেকে মনে করেন বিদ্যা শিক্ষায় শিল্প কাজের ব্যাঘাত করে, কিন্তু তাহা ভ্রম। বিদ্যা শিক্ষায় সকল কাজেরই সহায়তা করে। ফরাশী প্রুশীয় যুদ্ধে জর্ম্মনদের যে জিত হইল

তাহার একটা প্রধান কারণ তাহারা শিক্ষিত—এই নিমিত্ত তাহারা যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করিতে অধিকতর নিপুনতা লাভ করিয়াছিল।

---

আমাদের বিশ্বাস ছিল, যাহাদের এক ইন্দ্রিয় অসম্পূর্ণ তাহাদের অন্য ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণতর হয়। কিন্তু এ কথা সকল স্থানে খাটে না। দেখা গিয়াছে যাহারা বধির তাহারাই অধিকাংশ অন্ধ এবং যাহারা অন্ধ তাহারাই অধিকাংশ বধির।

---

কার্বনিয়ে নামক একজন ফরাসী পণ্ডিত বলেন যে, গঙ্গার নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র মৎস্য আছে তাহারা পাখীর ন্যায় জলে নীড় প্রস্তুত করে। ইহারা দেখিতে অতি সুন্দর, রামধনুর ন্যায় নানা বর্ণে রঞ্জিত। ইহারা জলের মধ্য হইতে এক প্রকার উদ্ভিদ্ মুখে করিয়া জলের উপরে রাখে পুনর্ব্বার তাহা জলমগ্ন না হয় এই উদ্দেশে তাহারা মুখ হইতে বায়ু নির্গত করিয়া জলবুদ্‌বুদের উপর তাহা ভাসাইয়া রাখে। পর দিন সেই গাছের মধ্যে জলবুদ্‌বুদ্ পূরিয়া দেয় এবং তাহা গোলাকারে পরিণত করে। পুরুষ মৎস্য তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা পরিষ্কার করিলে পর স্ত্রী মৎস্য ডিম পাড়িতে আহূত হয়। ডিম পাড়িয়া সে ত প্রস্থান করে, পুরুষ মৎস্য সেই ডিম্বের তত্ত্বাবধান করে। এইরূপে দশ দিবস যায়। ডিম ফুটিয়া গেলে সে সেই নীড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ফুটা করিয়া জলবুদ্‌বুদ্ কতকটা বাহির করিয়া দেয়। তখন তাহা আর গোলাকার থাকে না প্রশস্ত হইয়া পড়ে।

আমরা ত গঙ্গার কাছাকাছি থাকি কিন্তু এ মাছটি যে কি মাছ তাহা ত ঠিক জানি না। গঙ্গাতীরবর্ত্তী পাঠকেরা কি এই মাছের কোন খবর রাখেন?

---

## গতবারের হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর।

গত বারের হেঁয়ালী নাট্যের উত্তর "আগুন"। যাঁহারা ঠিক উত্তর প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহাদের নাম দেওয়া গেল:—শ্রীমতী জ্ঞানদাসুন্দরী দেবী (কলিকাতা); বাবু শৈলেশচন্দ্র মজুমদার (কলিকাতা); শ্রীমতী ইন্দুমতী দাসী (কলিকাতা); বাবু হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা); বাবু ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় (নাটুদহ); বাবু শশিভূষণ দত্ত (শ্রীহট্ট); বাবু জ্যোতীন্দ্রমোহন বসু (শ্রীহট্ট); বাবু কালীকুমার ঘোষ (বাঘটিয়া); বাবু কালিকাচরণ রায় (দাশোড়া)।

---

# মূল্য প্রাপ্তি।

বাবু কালীমোহন ঘোষ ডেরাডুন ২৲
,, বলাইলাল নন্দী কলিকাতা ২৲
,, বিরাজমোহন রায় বরিশাল ২৲
,, হরলাল সাহা আমতা ২৲
,, ভূপেন্দ্রনারায়ণ দত্ত কলিকাতা ২৲
,, হেমচন্দ্র ভড় ঐ ১৲
,, মিহিরনাথ রায় গয়া ২৲
,, নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পুর্ণিয়া ২৲
,, যোগেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী গঙ্গাধরদী ১৲
,, শরৎচন্দ্র রায় বরিশাল ২৲
" বিনোদশোভা বক্সি ঢাকা ২৲
,, বীরেশ্বর সেন ডিব্রুগড় ২৲
,, নন্দলাল চক্রবর্ত্তী রাওলপিণ্ডি ২৲
,, চন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ঐ ২৲
,, রমানাথ চক্রবর্ত্তী ঐ ২৲
শ্রীমতী গিরিবালা মিত্র কাইতী ১৲
বাবু রামঅক্ষয় দত্ত চৌধুরী বর্দ্ধমান ২৲
,, নাগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কাল্না ২৲
,, সতীশচন্দ্র দাস ত্রিপুরা ২৲
,, নবকিশোর পাল পাবনা ১৲
ডাক্তার রামদাস সেন বহরমপুর ২৲
বাবু শশিচরণ রায় চৌধুরী কলিকাতা ২৲
,, দেবেন্দ্রনাথ ভঞ্জ ঐ ১৲
কুমার উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী ঐ ২৲
বাবু তারাপ্রসন্ন রায় হাজারিবাগ ২৲
,, শ্রীরঙ্গ বিহারী দরভাঙ্গা ২৲
,, কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী দিনাজপুর ॥০
,, ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় নিবাধই ২৲
,, হেমন্তকুমার দত্ত ঐ ২৲
,, মনোমোহন সেন ঢাকা ১৲
,, অমৃতলাল সেন ঐ ১৲
,, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ২৲
,, নরেন্দ্রনাথ ঘোষ ঐ ১৲
,, সুরতনাথ মল্লিক ঐ ২৲
শ্রীমতী নীরদবাসিনী দেবী সিঙ্গাগুলপুর ১৲
বাবু ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ১৲

বাবু যতীন্দ্রনাথ বসু নড়াইল ২৲
,, জয়গোপাল মজুমদার বাঘডাঙ্গা ২৲
,, অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত মাদারিপুর ২৲
,, দেবেন্দ্রনাথ পাল রাজসাহী ১॥০
,, যোগেন্দ্রনাথ রায় কাশীপুর ২৲
,, হরিদাস গোস্বামী রাণাঘাট ২৲
,, কৈলাসচন্দ্র সরস্বতী রাজসাহী ১৲
,, তারাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ১৲
,, নারায়ণচন্দ্র ঘোষ ঐ ১৲
,, কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য ঐ ১৲
,, অটলবিহারী চট্টোপাধ্যায় দার্জিলিং ২৲
,, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী ঐ ২৲
,, বরদাসুন্দর গুপ্ত ময়মনসিংহ ২৲
Rev. C. Bomwetsch কলিকাতা ২৲
বাবু আনন্দমোহন দাস নোয়াখালী ১৲
,, নবকৃষ্ণ ভাদুড়ী কলিকাতা ২৲
,, প্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী সায়দাবাদ ২৲
,, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় তুষভাণ্ডার ২৲
,, গুণেন্দ্রনাথ অধিকারী পোরজনা ২৲
,, বৈকুণ্ঠচন্দ্র দত্ত শিলং ২৲
,, যোগীন্দ্রনাথ হালদার টাকী ॥০
,, কুঞ্জলাল সাহা দোগাচী ২৲
,, আবদুল আজীজ বোরহাট ২৲
,, শরৎচন্দ্র খাঁ কলিকাতা ২৲
,, তারকনাথ সেন নোয়াখালি ২৲
,, সারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ-বিঃ মেড়তলা ১৲
,, কালীনাথ বসু শ্রীনগর ২৲
,, চণ্ডীচরণ দত্ত কলিকাতা ২৲
,, চারুচন্দ্র মল্লিক ঐ ২৲
,, কৈলাসচন্দ্র দাস হবিগঞ্জ ২৲
,, প্রিয়নাথ মিত্র কলিকাতা ২৲
,, সতীশচন্দ্র মিত্র জামালপুর ॥০
,, অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিপুর ॥০
,, গোপালচন্দ্র মুখোপাঃ মিয়ানমীর ১৲
,, বরদাপ্রসাদ গঙ্গোপাঃ সাহাজাদপুর ২৲
,, নিলকমল রায় ঐ ২৲

| নাম | স্থান | টাকা |
|---|---|---|
| বাবু হরিশ্চন্দ্র সরকার | সাহাজাদপুর | ২৲ |
| ,, প্যারীমোহন ঘোষ | ঐ | ২৲ |
| ,, জানকীকিশোর বর্দ্ধন | ঐ | ২৲ |
| ,, রমাকান্ত সেন | কলিকাতা | ২৲ |
| ,, তারকচন্দ্র ধর | একরামপুর | ২৲ |
| ,, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় | আলিপুর | ১৲ |
| শ্রীমতী রাজবালা রায় | হরিনাভি | ২৲ |
| বাবু নরেন্দ্রনাথ মুখোপাঃ | হাজারিবাগ | ২৲ |
| ,, সারদাপ্রসাদ মুখোপাঃ | কলিকাতা | ২৲ |
| ,, প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ঐ | ৸৶০ |
| ,, অভয়চরণ মিত্র | ঐ | ২৲ |
| P. N. Bose Esq. | ঐ | ২৲ |
| শ্রীমতী নলিনীবালা রায় | ঐ | ২৲ |
| বাবু শরৎকুমার দত্ত | ঐ | ১৲ |
| ,, দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় | কৃষ্ণনগর | ২৲ |
| শ্রীমতী রাধারাণী লাহিড়ী | কলিকাতা | ২৲ |
| ,, জ্ঞানদাসুন্দরী দেবী | ঐ | ২৲ |
| ,, কালীদাসী দেবী | ঐ | ৸৶০ |
| বাবু হরিশ্চন্দ্র মস্তফি | ঐ | ৸০ |
| ,, নবকিশোর দে | বেলিয়াঘাটা | ১৲ |
| ,, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | কলিকাতা | ২৲ |
| ,, হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | আন্দুল | ১৲ |
| ,, শ্রীরাম পালিত | কলিকাতা | ২৲ |
| ,, উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় | ফরসডাঙ্গা | ১৲ |
| ,, নীলকমল বসাক | কলিকাতা | ১৲ |
| ,, মহেন্দ্রনাথ ঘোষ | ঐ | ১৲ |
| ,, গোপালচন্দ্র মল্লিক | ঐ | ১৲ |
| ,, দ্বারিকানাথ চট্টো | ঐ | ১৲ |
| ,, বিহারীলাল সান্ন্যাল | ঐ | ১৲ |
| ,, বিনায়কচন্দ্র চট্টোঃ | ভূকৈলাস | ১৲ |
| ,, প্রসন্নকুমার ঘোষ | কলিকাতা | ১৲ |
| ,, অবিনাশচন্দ্র চৌধুরী | আন্দুল | ১৲ |
| ,, নন্দলাল দে | কলিকাতা | ॥০ |
| ,, শরদিন্দ্রমোহন ঠাকুর | ঐ | ২৲ |
| ,, কালীকৃষ্ণ চৌধুরী | আন্দুল | ১৲ |
| ,, গোপীমোহন মল্লিক | কলিকাতা | ২৲ |
| শ্রীমতী শিশিরকুমারী দেবী | বলাগড়ি | ১৲ |
| ,, সরিদিন্দ্রবালা দেবী | কলিকাতা | ১৲ |

| নাম | স্থান | টাকা |
|---|---|---|
| বাবু ক্ষেত্রনাথ ঘোষ | ঐ | ১৲ |
| ,, প্রিয়নাথ রায় চৌধুরী | ঐ | ॥০ |
| ,, শ্যামলাল পাল | ঐ | ২৲ |
| ,, সুরেন্দ্রনাথ দে | ঐ | ১৲ |
| ,, কালিদাস গঙ্গোপাধ্যায় | ঐ | ২৲ |
| ,, যদুনাথ সিংহ | হাবড়া | ২৲ |
| ,, যদুনাথ বন্দোপাধ্যায় | শিবপুর | ১৲ |
| ,, আনন্দচন্দ্র দত্ত | কলিকাতা | ১৲ |
| ,, অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত | হালিসহর | ১৲ |
| ,, বিপিনবিহারী ঘোষ | চন্দননগর | ॥০ |
| ,, বিহারীলাল বন্দোঃ | কলিকাতা | ॥০ |
| ,, অক্ষয়কুমার ঘোষ | দেবানন্দপুর | ॥০ |
| ,, আশুতোষ দীর্ঘাঙ্গী | আন্দুল | ॥০ |
| ,, রাজেন্দ্রনাথ গুপ্ত | হাবড়া | ॥০ |
| ,, তারিণীচরণ ঘোষ | কলিকাতা | ১৲ |
| ,, কালীপ্রসন্ন ঘোষ | ঐ | ২৲ |
| ,, বিমলাচরণ চট্টোপাঃ | ঐ | ২৲ |
| ,, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় | ঐ | ১৲ |
| ,, কালীদাস আঢ্য | ঐ | ২৲ |
| ,, গুরুচরণ কবিরাজ | ঐ | ১৲ |
| ,, অম্বিকাচরণ মুখোঃ | ঐ | ১৲ |
| ,, সারদাকান্ত মিত্র | ঐ | ১৲ |
| ,, দেবেন্দ্রনাথ পাকড়াসী | ঐ | ১৲ |
| ,, সৌতীন্দ্রমোহন ঠাকুর | ঐ | ২৲ |
| ,, শ্যামাচরণ লাহিড়ী | শ্রীরামপুর | ২৲ |
| ,, নরসিংহচন্দ্র মুখোঃ | কলিকাতা | ১৲ |
| ,, চুনিলাল ঘোষ | ঐ | ১৲ |
| ,, যাদবচন্দ্র রায় | ঐ | ১৲ |
| ,, প্রিয়নাথ বসু | ঐ | ১৲ |
| ,, কেদারনাথ সেন | ঐ | ২৲ |
| কুমার সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাঃ | ঐ | ২৲ |
| বাবু ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী | ঐ | ১৲ |
| ,, নিবারণচন্দ্র চৌধুরী | ঐ | ॥০ |
| ,, নীলকমল বসু | টাঙ্গাইল | ২৲ |
| শ্রীমতী মহামায়া বসু | ঐ | ২৲ |
| বাবু গোকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | কলিকাতা | ২৲ |
| ,, হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ঐ | ১৲ |
| ,, প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ঐ | ২৲ |

আগা খাঁ।

নাগর ব্রাহ্মণ।

প্রসিদ্ধ বণিক।

গুজরাতী বণিক।

মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ।

১ম ভাগ। } বালক। { ৮ অষ্টম সংখ্যা।
অগ্রহায়ণ ১২৯২।

# বোম্বাই সহর।

বোম্বায়ে গুজরাত মহারাষ্ট্র, কর্ণাট প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে নানাজাতীয় হিন্দু একত্রিত। গুজরাতীদের অধিকাংশ বাণিজ্য ব্যবসায়ে রত। বাণিজ্য সম্বন্ধীয় ভাষা গুজরাতী। গুজরাতী বণিকদিগের যে সমস্ত জাতি বিভাগ আছে তাহা

**গুজরাতী বণিক** — এস্থলে উল্লেখ করা অভিপ্রেত নহে। তাহাদের অর্জন-স্পৃহা অত্যন্ত প্রবল। সাইলকসদৃশ অর্থলোভ ও ক্রূরতা বণিক জাতির জাতীয় ধর্ম্ম কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উদ্যম ও কর্ম্মদক্ষতা প্রশংসার যোগ্য। পারস্য উপসাগর ও ভারত সাগরের উপকূলস্থ প্রদেশের সহিত বাণিজ্য-সূত্র পুরাকাল হইতে এই সকল বণিকদের হস্তে নিহিত এবং এ কালেও পূর্ব্ব আফ্রিকা, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব আরব্যের বাণিজ্য জাঞ্জিবার মস্কট প্রভৃতি স্থানে এই সকল বোম্বাই-বণিকদের এজেণ্ট কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হয়। ইয়োরোপীয়েরা প্রথমে যখন এদেশে পদার্পণ করে তখন বণিকদের সঙ্গেই তাহাদের প্রধান কারবার। তাঁহাদের একজন এক প্রবাদ লিখিয়া গিয়াছেন—"ইহুদি তিন এক চীন—তিন চিনে এক বেনে।" মধ্য হিন্দুস্থান হইতে বহু সংখ্যক মারওয়াড়ী এদেশে আসিয়া বাস করিতেছে—বণিকদের সঙ্গে তাহাদের রীতি চরিত্রে অনেক সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। প্রত্যুত মারওয়াড়ী মধ্য ভারতের স্বর্ণবণিক। তাহারা একজাতীয় মাকড়সা—একবার তাহাদের ঋণজালে বদ্ধ হইলে আর রক্ষা নাই, ধন প্রাণে বিনষ্ট হইতে হয়।

**মহারাষ্ট্রী** — মহারাষ্ট্রীদের দলও সামান্য প্রবল নহে। তাহাদের ভাষা দক্ষিণে কৃষ্ণানদী হইতে উত্তরে তাপ্তী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মহারাষ্ট্রীরা বাণিজ্য-ব্যবসায়ে সুদক্ষ নহে। তাহাদের মধ্যে বণিকব্যবসায়ী দোকানদার অধিক নাই। ইংরাজ অধিকারের পূর্ব্বে তাহাদের যে শৌর্য্য বীর্য্য রাজনীতিকুশলতা দৃষ্ট হইত এক্ষণে তাহা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। মফঃস্বলে অনেকে মেষপালন ও কৃষিকার্য্যে রত—নাগরিকদের মধ্যে যাহারা ভদ্রলোক তাহারা কেরাণিগিরি ও আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত—ছোট লোকেরা অনেকে সইস কোচমান। এদেশের পূর্ব্ব বীরত্ব অস্তমিত হইয়াছে। শিবাজীর সে মাওলী সেনার বংশ এক্ষণে কোথায়? সমস্ত ভারতের ত্রাসদায়ক সাহসী বর্গীরা এক্ষণে কৃষকের হলধারণ করিয়া দীনহীন ভাবে যথাকথঞ্চিৎ দিনপাত করিতেছে।

এ অবস্থা ব্রিটিশ শাসনের অব্যর্থ ফল। এই সুগভীর শান্তির মধ্যে সেই সমস্ত বীরপুরুষদের দাঁড়াইবার স্থান নাই—আইনের বলে তাহারা নিরস্ত্র; শান্তিভঙ্গকারীদের গতি মাজিষ্ট্রেটের কোর্ট অথবা জেলখানা। এইরূপ নির্বীর্য্যতা ইংরাজ রাজপুরুষদিগের প্রার্থনীয় বটে; ইহাতে প্রজা শাসন কার্য্য বিনা ক্লেশে সম্পাদিত হয়। যতদিন ইংরাজ রাজ্য বিদ্যমান ততদিন কোন ভাবনা নাই কিন্তু যদি কখন এমন কাল উপস্থিত হয় যে ইংরাজেরা এদেশ ছাড়িয়া যাইতে উদ্যত—যদি অন্তর কিম্বা বাহির হইতে এমন কোন বিপদ ঘটে তাহা হইলে আত্মরক্ষায় অসমর্থ এই কোটি কোটি প্রজাপুঞ্জের যে কি দশা হইবে তাহা কল্পনা করিতেও ভয় হয়। যাঁহাদের হস্তে ভারতবর্ষের হিতাহিত সমস্ত নির্ভর তাঁহাদের কি দূরদৃষ্টি দিয়া এ বিষয়ে একটীবার দৃক্‌পাত করা বিধেয় না? এখন হইতে ইহার প্রতিবিধানের উপায় চেষ্টা কি যুক্তিসঙ্গত নয়?

ব্রাহ্মণদের মধ্যে মহারাষ্ট্রী, গুজরাতী, কনোজ, তৈলঙ্গী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ব্রাহ্মণ দৃষ্টিগোচর হয়। মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণের দেশস্থ, কোকণস্থ ও কহ্লাড় এই তিন প্রধান শাখা। তাঁহাদের পরস্পর পান ভোজন চলে কিন্তু আদান প্রদান বড় একটা নাই। আমাদের দেশে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে মেলামেশা যেরূপ প্রার্থনীয় ইহাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বন্ধনও তদ্রূপ এবং সংস্কারকর্ত্তাদের লক্ষ্য ওদিকে দেখা যায়, নিদান কথায় তাঁহারা ঐক্য বন্ধনের আবশ্যকতা স্বীকার করেন। শুনিতে পাই, শঙ্করাচার্য্য ঐ বিষয়ে অনুকূল ব্যবস্থা দিয়াছেন। সেনওয়ী নামে একজাতীয় ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা আপনাদিগকে গৌড় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। যদিও তাঁহারা অন্যান্য ব্রাহ্মণের দেখাদেখি শুদ্ধাচারের ভান করিয়া থাকেন তথাপি তাঁহাদের জাতিতে আমিষ ভক্ষণ, বিশেষতঃ মৎস্যাহার নিষিদ্ধ নহে। সম্ভবতঃ তাঁহারা বাঙ্গালা দেশ হইতে এদেশে আসিয়া পুরুষানুক্রমে বাস করিতেছেন। গুজরাতী ব্রাহ্মণদের মধ্যে নাগর ব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রধান।

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও শূদ্র জাতির বিবরণ ক্রমান্বয়ে বলিতে গেলে অনেক কথা বলা আবশ্যক তাহার স্থানও নাই সময়ও নাই। এই স্থলে দাক্ষিণাত্যের লিঙ্গায়ৎ

**লিঙ্গায়ৎ** জাতির উল্লেখ করিয়া এ ভাগ সমাপ্ত করা যাক্। লিঙ্গায়তেরা শিব-উপাসক কিন্তু সাধারণ হিন্দুসমাজ বহির্ভূত, বৈদিক অনুষ্ঠানবিরহিত স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। তাহারা স্ত্রী পুরুষ সকলেই গলদেশে শিবলিঙ্গ ধারণ করে তাহা হইতে তাহাদের নাম লিঙ্গায়ৎ। শিব ও শিবের পরিবারস্থ পার্ব্বতী গণপতি তাহাদের উপাস্য দেবতা ও শিবের বাহন নন্দীর উপর তাহাদের প্রগাঢ় ভক্তি। তাহাদের আদিগুরুর নাম বৃষভ * (বসপ্পা বৃষভের অপভ্রংশ) লিঙ্গায়তেরা তাঁহাকে নন্দীর অবতার বলিয়া বিশ্বাস

* অক্ষয় বাবুর সম্প্রদায় পুস্তকে এই নাম বাসব বলিয়া অভিহিত হইয়াছে তাহা ভুল।

করে। তিনি বিজাপুর অঞ্চলে একটী শৈব ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ করেন ও ১১৬৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বৃবভ পুরাণ নামক একখানি পুরাণে তাঁহার চরিত্র বর্ণনা আছে। এই পুরাণ লিঙ্গায়ৎদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ। এই পুরাণের মতে জাতিভেদ, প্রায়শ্চিত্ত, তীর্থভ্রমণ, ব্রাহ্মণ ভোজন ও উপবাস, শৌচাশৌচ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আবশ্যকতা, স্ত্রীলোকদের অপদস্থতা প্রভৃতি সাধারণ হিন্দুধর্ম্মের বিধি ও উপদেশ ভ্রমাত্মক বলিয়া পরিত্যক্ত। কিন্তু ধর্ম্মের উপদেশ যতই উচ্চ হউক না কেন তাহা অনুষ্ঠানে পরিণত বলিয়া বোধ হয় না। ফলে এই সকল উপদেশের বিপরীত আচরণ দৃষ্ট হয়। হিন্দুদের মত সেই জাতিভেদ, সেই ক্রিয়াকাণ্ড সেই তীর্থভ্রমণ—সেই স্ত্রীপুরুষের ভিন্নাধিকার লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে। একমাত্র শিবের পূজার উপরে অন্যান্য দেব দেবী ও সাধু ভক্তের পূজা স্থান পাইয়াছে।

লিঙ্গায়ৎ পুরোহিতের নাম জঙ্গম। জঙ্গমের মধ্যে গৃহস্থ ও বিরক্ত দুই শ্রেণী। গৃহস্থ জঙ্গম বিবাহ করে বিরক্ত জঙ্গম অবিবাহিত। লিঙ্গায়ৎদের শবদাহন প্রথা নাই—গোর দেওয়া তাহাদের রীতি। মৃত্যু তাহাদের নিকট ভয়ের বস্তু নহে। মৃত্যুতে তাহাদের অশৌচ হয় না। প্রত্যুতঃ মৃত্যুর সোপান হইতে জীবাত্মা কৈলাস সদনে অধিরোহণ করে এই বিশ্বাস বশতঃ মৃত্যুতে তাহাদের অভিনন্দন। লিঙ্গায়ৎ মৃত্যুগৃহে অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করা যায়। একদিকে বিধবার ক্রন্দনধ্বনি—অন্য দিকে বাদ্য সমারোহে জঙ্গমদের ভোজ লাগিয়া গিয়াছে। মৃত্যুর পর দেহ পুষ্প চন্দন বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া বিমানে করিয়া সমাধি স্থলে সমানীত হয়। সম্মুখে বাদ্যের ঘটা, পশ্চাতে শবযাত্রী চলিয়াছে। পুরোহিতদিগের এমনি প্রভুত্ব যে গুরুর পাদোদক মৃতদেহের উপর সিঞ্চিত হয় ও শিবের প্রতি তাঁহার আজ্ঞাপত্র দেহোপরি সংলগ্ন হয়। সে পত্র প্রাপ্তি মাত্র মহাদেব জীবাত্মাকে নিজ নিকেতনে সাদরে ডাকিয়া লইবেন। সমাধি স্থলে পুরোহিতেরা উপস্থিত থাকিয়া আত্মার সদ্গতি সাধনের বিহিত উপায় যোজনা করিতে থাকেন।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিম স্থিত কর্ণাট প্রদেশে এই সম্প্রদায় ক্রমশঃ প্রাদুর্ভূত হইয়া মহারাষ্ট্র, গুজরাত ও অন্যান্য দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

**মুসলমান** } বোম্বাই বাসীর পঞ্চমাংশ মুসলমান। মুসলমানদের প্রধান দুই শ্রেণী—সুন্নী ও সিয়া। মহম্মদের উত্তরাধিকারী কালিফদের লইয়া এই দুই সম্প্রদায়ের মতভেদ। সুন্নী মুসলমানেরা আবুবকর, ওমার প্রভৃতি পরম্পরাগত ইমামগণের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি স্থাপন করে। সিয়া মুসলমানদের বিশ্বাস এই যে, মহম্মদের জামাতা—তাঁহার প্রিয়তম দুহিতা ফতেমার স্বামী যে আলী তিনিই তাঁহার সিংহাসনাধিকারী যথার্থ ইমাম। আলির অভাগা পুত্রদ্বয় হাসেন হোসেন শত্রুহস্তে নিহত হয়, এই ঘটনা স্মরণ করিয়া মহর্‌রমের সময় সিয়া মুসলমানেরা বক্ষাঘাত ও আর্ত্তনাদ দ্বারা হৃদয় বিদারক শোক প্রকাশ করিয়া থাকে। ঐ উপলক্ষে বিরুদ্ধ মতাবলম্বী সুন্নী-

দিগের উল্লাস ও অভিনন্দন। তুর্ক ও আরবজাতি প্রধানতঃ স্থন্নী মুসলমান, পারসীকেরা প্রায় সিয়া সম্প্রদায়ী। বোম্বায়ে সিয়া মুসলমানদের সংখ্যা সম্ভবতঃ অধিক।

বোম্বাইবাসী মুসলমান অন্যতর প্রণালী অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ হইতে পারে—দেশী ও বিদেশী মুসলমান। যাহাদের আসলে হিন্দুকুলে জন্ম ও যাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা স্বেচ্ছাক্রমে অথবা বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছে তাহাদের দেশী মুসলমান বলা যাইতে পারে—তদ্ভিন্ন আর সকলে বিদেশী শব্দের বাচ্য। এই সমস্ত মুসলমান জাতির মধ্যে পরস্পর বিবাহ সম্বন্ধ হইয়া এক্ষণে যদিও মিশ্র জাতিই অধিক দৃষ্ট হয় তথাপি তন্মধ্যে কতকগুলি সম্প্রদায় অবিমিশ্র থাকিয়া এখনো পর্য্যন্ত স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া আসিতেছে। যথা কোঙ্কনী মুসলমান দক্ষিণী মুসলমান কচ্ছী মেমন ইত্যাদি। বোহরা বলিয়া একজাতীয় মুসলমান যাহারা "হকর"দের মত দ্বারে দ্বারে জিনিস বেচিয়া বেড়ায় তাহাদের অধিকাংশ মুল গুজরাতী হিন্দুবংশীয়, একাদশ শতাব্দীতে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। তাহারা সিয়া সম্প্রদায়ী। তাহাদের প্রধান আবাস স্থান স্থরাট ও স্থরাটের মুল্লা সাহেব তাহাদের ধর্ম্ম যাজক। তাহাদের ভাষা গুজরাতী। বোরারা অত্যন্ত কাজের লোক—এমন স্থান নাই যেখানে তাহাদের গতি নাই এমন জিনিস নাই যা তাহাদের নিকুটে পাওয়া যায় না। দিল্লীর সোনা রুপার গহনা—কাশ্মীরের সাল—রামপুর চাদর—ঢাকাই মলমল—বোম্বাই কচ্ছ ও কাশ্মীরের শিল্প ও কারুকার্য্য, চীন ও ইউরোপের পশম ও রেসমের কাপড় আরো কত রকম জিনিস এই সকল ভ্রমনকারী বোরার বোচকার মধ্যে গচ্ছিত, তাহার ঠিকানা নাই। কিন্তু ক্রেতাদিগকে একটী বিষয়ে সাবধান থাকিতে হয়। বোরার কোন জিনিসের নিয়মিত দরদাম নাই—খরিদদার বুঝিয়া দর ডাকিয়া বসে ও এতগুণ বেশী ডাকা হয় যে হাজার কমাইলেও তাহার বিলক্ষণ লাভ হাতে থাকে। ইংরাজ মহিলা বোরার প্রধান খদ্দের। বোম্বায়ে দেখিবে মেম সাহেবের দরজায় দোকান খুলিয়া বোরাজী ধন্না দিয়া বসিয়া আছেন।

খোজা নামক আর একটী সম্প্রদায় আছে তাহারাও হিন্দু মুসলমান। খোরাসান হইতে সমাগত পীর সদরুদ্দীন কর্ত্তৃক তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ চারি শত বৎসর পূর্ব্বে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। যদিও খোজারা আপনাদিগকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দেয় কিন্তু তাহাদের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মানুষ্ঠান হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্ম মিশ্রিত। কাজীরা তাহাদের উদ্বাহক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া দেয় বটে কিন্তু অনেক বিষয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়া থাকে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে পর হিন্দুমতানুসারে নানাদিন নানাপ্রকার জাত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ও মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট কোরাণের কিয়দংশ ও দশাবতারের উপাখ্যান উভয়ই পঠিত হয়। মৃত্যু ঘটিলে পর হিন্দু ও মুসলমান উভয় শাস্ত্রানুযায়ী অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। খোজারা হিন্দু ও মুসলমান উভয় তীর্থই পর্য্যটন করে ও হিন্দুশাস্ত্রোক্ত দায়াধিকার প্রভৃতি ব্যবহার প্রণালী অবলম্বন

করিয়া চলে। মহম্মদের জামাতা আলীর প্রতি তাহাদের বিশেষ ভক্তি। আলী কল্কী অবতার হইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এই তাহাদের বিশ্বাস। পারস্য রাজবংশীয় আগা খাঁ খোজাদের ধর্ম্ম গুরু ও আলির প্রতিনিধি স্বরূপে পূজিত। আগা খান্নের পুত্র ও উত্তরাধিকারী আগাখালী সা খোজামণ্ডলীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া সম্প্রতি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

মুসলমানদের বিবরণ বলিতে গিয়া তাহাদের ইদানীন্তন শোচনীয় দৈন্যদশার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। সে দিন যাঁহারা সদ্দার জাহাগীরদার সুবেদার সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন এইক্ষণে তাঁহারা অধিকাংশ পেয়াদা ও খানসামার কাজে দীনহীন ভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। যাঁহাদের সধর্ম্মীগণ পুরাকালে কাব্য সাহিত্য বিজ্ঞান ক্ষেত্রে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বিদ্যা শিক্ষায় মনোযোগ নাই; কোরা-ণের দুই পাতা উল্টাইয়াই আপনাদিগকে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মনে করেন। অনেকে নিষ্কর্ম্মা উদ্যোগ শূন্য, অন্যেরা নির্ধন, অন্নচিন্তায় আকুল। যাঁহারা উহার মধ্যে শ্রীমন্ত তাঁহারা অর্থের সদ্ব্যবহার জানেন না—নিকৃষ্ট আমোদ প্রমোদে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া প্রায়ই ঋণ জালে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। এই জাতির উদ্ধারের উপায় কি? তাহাদের দলপতি-দিগকে মধ্যে মধ্যে গবর্ণমেণ্টের নিকট কাতরস্বরে ক্রন্দন করিতে দেখা যায় কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যতদূর করিবার তাহা করিতেছেন। * আমি বলি যে হে ভ্রাতৃগণ! তোমাদের নিজের হাতেই তোমাদের মুক্তি। তোমরা আপনাদিগকে আপনারা না সামলাইলে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা বৃথা। তোমরা সরকারী চাকরী লাভের জন্য উৎসুক কিন্তু বিদ্যা ও যোগ্যতা ব্যতীত সরকারী চাকরী আদায় করা যায় না। কুলমর্য্যাদা ও সুপা-রিসের বলে এখন কিছুই হয় না। অতএব তোমাদের পুত্রদিগকে বিদ্যাধ্যয়নে নিযুক্ত কর। যদি উচ্চশ্রেণীর পদাকাঙ্ক্ষা থাকে যদি তোমাদের নষ্ট সম্পত্তির কিয়দংশ ফিরিয়া পাইবার বাসনা থাকে তবে উচ্চ শিক্ষা উপার্জ্জনে যত্নশীল হও—ব্রিটিস রাজ্যে যে উন্ন-তির পথ হিন্দু মুসলমান সকল জাতির জন্যই উন্মুক্ত রহিয়াছে তাহা অবলম্বন কর—অভীষ্ট সিদ্ধির আর উপায়ান্তর নাই।

পারসী } কিন্তু বোম্বায়ে যে জাতির বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়, যাহার অধিষ্ঠানে বোম্বায়ের বোম্বায়ত্ব বলিলেও বলা যায় সে পারসী জাতি। এ জাতির সংখ্যা সামান্য, সমস্ত হিন্দুস্থানে মিলিয়া ১ লক্ষ হয় কিনা সন্দেহ কিন্তু ইহাঁদের অসামান্য উদ্যম অধ্য-বসায় কার্য্যনিষ্ঠতা ও বদান্যতা গুণে ইহাঁরা এদেশীয় জনপদের অগ্রগণ্য তাহার সন্দেহ নাই। পারসীরা যেরূপে এদেশে প্রবেশ লাভ করিল তাহার বৃত্তান্ত এই। সপ্তম

---

* মুসলমান আবেদন পত্রের উত্তরে যে আজ্ঞাপত্র ইণ্ডিয়া গেজেটে সম্প্রতি প্রকা-শিত হইয়াছে তাহাতে এবিষয়ের সুবিহিত সমালোচনা দৃষ্ট হইবে।

শতাব্দীতে পারস্যদেশ মুসলমান জাতি কর্ত্তৃক বিজিত ও তাহার শেষ রাজা রাজ্যভ্রষ্ট হইলে পর অবশিষ্ট অগ্নি উপাসক ধর্ম্মনাশ ভয়ে দেশত্যাগী হইয়া বন জঙ্গল পাহাড় পর্ব্বতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এইরূপে কতক বৎসর অতি কষ্টে অতিবাহিত করিয়া তাঁহাদের এক দল লোক ভারতবর্ষে কাঠেওয়াড় প্রান্তের দিউ নামক বন্দরে আসিয়া অবতীর্ণ হন। তথায় তাঁহারা উনবিংশতি বৎসর যাপন করিয়া জনৈক পারসী জ্যোতির্ব্বীর পরামর্শে সেস্থান হইতে গুজরাতে প্রস্থান করেন। এই যাত্রীদল সমুদ্রের উপর প্রবল ঝড় তুফানে আক্রান্ত হইয়া পরিশেষে গুজরাটের অন্তর্গত সঞ্জান নামক স্থানে নির্ব্বিঘ্নে উপনীত হইলেন। সেই প্রদেশ তখন যাদু রাণা নামে এক ক্ষত্রিয় রাজার শাসনাধীন ছিল। যখন পারসীরা যাদু রাণার শরণ প্রার্থনা করিলেন তখন রাজা তাঁহাদের রীতি নীতি ধর্ম্মাদি জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে তাঁহারা নিজ জাতি বৃত্তান্ত ষোড়শ সংস্কৃত শ্লোকে সন্নিবিষ্ট করিয়া রাজার কর্ণগোচর করেন। এই সকল শ্লোক হইতে পারসীদের আচার ব্যবহার বিশ্বাস ও ধর্ম্ম বিষয়ের কতক আভাস পাওয়া যায়। দেখিবে তাঁহারা গৌরা ধীরাঃ সুবীরা বহুবল নিলয়াস্তে বয়ং পারসীকাঃ বলিয়া কেমন গর্ব্বের সহিত আপনাদের পরিচয় দিয়াছেন। ইহার কতিপয় শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১। সূর্য্যং ধ্যায়ন্তি যে বৈ হুতবহ মনিলং ভূমি মাকাশ মাদ্যং
তোয়েশং পঞ্চতত্বং ত্রিভুবন সদনং ন্যায় মন্ত্রৈ স্ত্রি সন্ধ্যং
শ্রীহোর্মজ্দং সুরেশং বহু গুণ গরিমাণন্তমেকং কৃপালুং
গৌরাধীরাঃ সুবীরা বহুবল নিলয়া স্তে বয়ং পারসীকাঃ।

আমরা সূর্য্য, অগ্নি, অনিল, জল স্থল আকাশ পঞ্চভূত ও বহুগুণযুক্ত সুরেশ হোর্মজ্দকে ন্যায় মন্ত্র দ্বারা ত্রিসন্ধ্যা ধ্যান করি। আমরা সেই গৌর ধীর সুবীর বহুবলনিলয় পারসীক।

৩। রম্যং স্বাঙ্গে সুবস্ত্রং কবচ গুণময়ং কঞ্চুকং যে ধরন্তি
যুক্তামূর্ণাং সুপুষ্টা মহি মুখ সমিতাং বন্ধনং সর্ব্ব কট্যাং
মূর্ধানং চিত্রবস্ত্রৈঃ পট যুগল তলৈ শ্ছাদয়ন্তীহ নিত্যং
গৌরাধীরাঃ সুবীরা বহুবল নিলয়াস্তে বয়ং পারসীকাঃ॥

আমরা স্বদেহে কবচ গুণময় কঞ্চুক, কটিদেশে অহিমুখ রেশমের কটিবন্ধ, মস্তকে পট যুগল চিত্রবস্ত্র ধারণ করি আমরা সেই গৌর ধীর সুবীর বহুবল নিলয় পারসীক।

১৩। ঊর্ণারূপাং সুবর্ণাং সুললিত ফলদাং জাহ্নবী স্নান পুণ্যাং
মেষাণাং চৈব পুংসাং ঘনগুণ রচিতাং হেমবর্ণাঙ্কুরম্যাং
নাগাকারাং বিশালাং গুরুজন বচনৈ র্মেখলাং ধারয়ন্তি
শাস্ত্রোক্তাং শ্রোণিদেশে হ্যরুতর জঘনে গৌর ধীরাঃ সুবীরাঃ॥

আমরা গুরুজন বচনে শ্রোণি দেশে নাগাকার সুললিত ফলদা সুবর্ণা ঊর্ণা পুণ্যা মেখলা ধারণ করি।

১০। বেশ্যাভির্নৈব সঙ্গং পিতৃসম শুচিতা শ্রাদ্ধকালে হগ্নিচিন্তা
নোমাংসং যজ্ঞবাহ্যং স্বপিতি নহি ধরায়া মহো পুষ্পনারী
বৈবাহ্যে লগ্ন শুদ্ধি স্বশুচিনহি মতা ভর্তৃহীনা পুরন্ধ্রী
যেষামাচার এবং প্রতিদিন মুদিতো গৌরধীরাঃ সুবীরাঃ ॥

বেশ্যাসঙ্গ বর্জন, পিতৃসম শুচিতা, শ্রাদ্ধকালে অগ্নিচিন্তা যজ্ঞ মাংস ভোজন ঋতুকালে নারীর ধরাশয্যা নিষেধ বিবাহে লগ্ন শুদ্ধি ভর্তৃহীনা পুরন্ধ্রী শুচিমতা এই আমাদের আচার।

১১। চত্বারিংশদ্দিনানি প্রচরতি ন বধূ পাককার্য্যে প্রসূতা
মৌনাঢ্যা স্বল্প নিদ্রা জপবিধি নিরতা স্নান সূর্য্যার্চনেষু
ধ্যায়ন্তে চৈব নিত্যং মরুদনল ধরা তোয় চন্দ্রার্ক যজ্ঞং
যেষাং বর্ণোনহীনঃ সতত মভয়তো গৌরধীরাঃ সুবীরাঃ ॥

বধূ প্রসূত হইলে চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত পাককার্য্য হইতে বিরত মৌনাঢ্য স্বল্পনিদ্র স্নান সূর্য্যার্চনা জপবিধি নিরত, মরুৎ অনল ধরা তোয় চন্দ্রার্ক ধ্যান মগ্ন সদা অহীন বর্ণ আমরা সেই গৌরধীর সুবীর।

১৬। শ্রীহোর্মজ্‌দেজ্য মুখ্যঃ সকল বিজয় কৃৎ পুত্র পৌত্রেষু বৃদ্ধি
দাঁতা শ্রী পাতু বোয়ং বহুধন ফল কৃন্নশ্যতু ক্লেশ পাপং
তে সর্ব্বে পারসীকাঃ সতত বিজয়িনঃ শ্রী জয়েচ্চৈব নিত্যং
গৌরাধীরাঃ সুবীরা বহুবল নিলয়াস্তেবয়ং পারসীকাঃ ॥

সেই সকল বিজয় কৃৎ বহুধন ফলদ শ্রী হোর্মজ্‌দ্ তোমারদিগকে রক্ষা করুণ ও তোমার পাপ তাপ নাশ করুণ ইত্যাদি।

রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় রাজ্যে বাস করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন ও তাঁহাদের বাসযোগ্য একখণ্ড ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কিন্তু এইরূপ অনুমতি দিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের নিকট হইতে কতকগুলি করার আদায় করিয়া লইলেন। যথা

তাঁহারা স্বভাষা ছাড়িয়া দেশভাষা ব্যবহার করিবেন, শস্ত্র পরিত্যাগ করিবেন, তাঁহাদের স্ত্রীগণ হিন্দু নারীদের বেশ ধারণ করিবে, রাত্রে বিবাহ লগ্ন পরিপালিত হইবে এইরূপ কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে তাঁহারা অগত্যা প্রতিশ্রুত হইলেন। অল্প কাল মধ্যে তাঁহাদের অগ্নি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। তাঁহাদের শ্রম ও যত্নে ও অঞ্চলের শ্রী ফিরিল। বন জঙ্গল পরিষ্কার হইয়া ফলপুষ্পশোভিত উদ্যান ও পতিত ভূমি শস্যশালিনী উর্ব্বরা ভূমিতে পরিণত হইল। এই ঘটনার তারিখ বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয় কিন্তু তাহা মোটামুটি অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। সঞ্জানে কিছু কাল বাস করিয়া পারসীরা ক্রমে উত্তর গুজরাটের নওসাড়ী, ভরুচ, খম্বায়ৎ প্রভৃতি স্থানে ব্যবসাদার ও বাসন্দা রূপে ছড়াইয়া পড়িলেন।

ইহার ছয় শত বৎসর পরে আল্লাউদ্দীন বাদসাহের সেনাপতি আলপ্ খাঁ সঞ্জান আক্রমন করেন। সে সময়ে পারসীদের বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। রাণার আদেশক্রমে ১৪০০ কবচ ধারী অশ্বারোহী পারসী সেনা সজ্জীভূত হইল—আর্দ্দেসীরর পারসী তাঁহাদের নেতা। তাঁহাদের বলবিক্রমে প্রথমে মুসলমান সৈন্য বিপর্য্যস্ত পরাজিত ও তাড়িত হয়। কিন্তু আলপ্ খাঁ সহজে ছাড়িবার পাত্র নন, পরদিবস ভগ্নসেনা একত্র করিয়া পুনরায় যুদ্ধারম্ভ করেন। সেই যুদ্ধে হিন্দুদের পরাজয়। বীর আর্দ্দেসীরর বাণাঘাতে হত হইলেন ও সঞ্জান মুসলমানদের হস্তে পতিত হইল। পারসীরা তাঁহাদের সাধের সঞ্জান হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া অন্যত্রে বাসস্থান অন্বেষণ করিতে বাধ্য হইলেন। এইক্ষণে সঞ্জানে একটী মাত্র পারসীরও বসতি নাই—কেবল পারসী শবাগারের ভগ্নাবশেষ তাঁহাদের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে।

ইহার পর শতাব্দী পর্য্যন্ত পারসী ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই শ্রুতিগোচর হয় না। ১৪১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের পূতাগ্নি সঞ্জানের অগ্নি মন্দির হইতে নওসাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়।

১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে আকবর বাদসাহের আদেশক্রমে পারসীরা নওসাড়ী হইতে তাঁহাদের কতকজন বিচক্ষণ ধর্ম্মযাজক দিল্লীতে প্রেরণ করেন। তাঁহারা সম্রাটের নিকট পারসী ধর্ম্মের ব্যাখ্যান ও উপদেশ করেন। উদারমতি আকবর তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া পারসী হুতাগ্নি রক্ষা করিবার অনুমতি করেন ও পারসী গুরুকে নওসাড়ীর নিকটস্থ ভূমি সম্পত্তি উপহার দেন। কথিত আছে যে সম্রাট পারসী জামা ও কটিবন্ধ পরিধান করিয়া পারসী ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

ইউরোপীয় জাতির আবির্ভাবের পর হইতেই পারসীদের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির সূত্রপাত বলিতে হইবে। তাঁহারা দালাল ও মধ্যস্থ হইয়া ইউরোপীয় কুটীওয়ালাদের অনেক কার্য্য করিতেন। ইংরাজদের সহিত প্রথম হইতেই তাঁহাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা বন্ধন হয়। সুরাটের বাণিজ্য হ্রাসোন্মুখ হইয়া যখন বোম্বাই সহর শির উত্তোলন করিতে আরম্ভ করে তখন পারসীরা বোম্বাইয়ে আসিয়া কেহ বাণিজ্য ব্যবসা, দোকানদার কণ্টাক্টদারের কাজ কেহ বা পোতনির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সুখ্যাতি লাভ করেন। ব্রিটিসদের রাজ্য বৃদ্ধি ও ব্রিটিস বণিকদের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পারসীদের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হয়।

প্রাচীন কাল হইতেই পারসীদের ইংরাজ রাজভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সুরাটে যখন ইংরাজ বণিকগণ মোগল কর্ত্তৃপুরুষদের অত্যাচারে প্রপীড়িত হন তখন রোস্তম মাণক নামক একজন পারসী ইংরাজদের প্রতিনিধি স্বরূপে ঔরঙ্গজীবের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বাদসাহের নিকট ইংরাজদের হইয়া দরবার করেন। তাহারও পূর্ব্বে রোস্তমজী দোরাবজী কিরূপে বোম্বাই নগর রক্ষা করিয়াছিলেন তাহার গল্প বলি শুন। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে বোম্বায়ে এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ও মড়ক উপস্থিত হয় তাহাতে অনেক

BY H C HALDER.

ইউরোপীয় বাসন্দা ও দুর্গরক্ষিণী সেনা কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। এই সুযোগে জিঞ্জিরার হাবসী নবাব মহতী সেনা সমভিব্যাহারে বোম্বাই সহর আক্রমণ করেন, পূর্ব্বেই এই ঘটনার উল্লেখ করা গিয়াছে। দ্বীপ ও কেল্লা নবাবের হস্তগত হয়। ইংরাজরা এই মড়কের উপদ্রবে এরূপ হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে হাবসীদের সঙ্গে পারিয়া উঠেন নাই। এই ঘোরতর শঙ্কটে রোস্তমজী রোস্তম সদৃশ বীরত্ব সহকারে অরি দল বিপক্ষে কটিবদ্ধ হইলেন। ধীবর জাতি হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তিনি আক্রমণকারী-দের সহিত যুদ্ধ করেন ও তাহাদিগকে সংগ্রামে পরাস্ত করিয়া তাড়াইয়া দেন। এই জয়-লাভের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সুরাট কুটির অধ্যক্ষ বোম্বায়ে আসিয়া রাজ্য ভার গ্রহণ করি-লেন। একজন পারসীর সাহায্যে বোম্বাই পুরী এক ভয়ানক বিপদ হইতে উদ্ধার পাইল। কেমন অল্প কারণ হইতে গুরুতর কার্য্য উৎপন্ন হয় এ ঘটনা তাহার এক দৃষ্টান্ত স্থল।

পারসীরা অশেষ বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে তাঁহাদের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে ও তাঁহাদের বাণিজ্যদক্ষতা দানশীলতা ও সার্ব্ব-জনিক কার্য্যে উৎসাহ বশতঃ তাঁহাদের যশোরব ভারত ভূমিতে প্রসারিত হইতেছে।

**পারসী ধর্ম্ম** — পারসী জাতি সাধারণতঃ অগ্নি উপাসক বলিয়া প্রখ্যাত কিন্তু ঐ সংজ্ঞা তাঁহাদের প্রকৃত সংজ্ঞা বলা যায় না। যে সকল পণ্ডিতেরা পারসী ধর্ম্ম সবিশেষ অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে পারসীরা বাস্তবিক একেশ্বর উপাসক, অগ্নি সূর্য্যে ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ দেখিয়া তাঁহারা ঐ দুই পদার্থে শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করেন।

**জরতোস্ত** — পারসীরা জরতোস্তের শিষ্য ও অনুচর বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন। জরতোস্তের জন্মকাল নির্ণয় করা সুকঠিন। ডাক্তার হোগের মতে নিদান তাহা খৃষ্টাব্দের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট করা অসঙ্গত নহে। আবার এরূপ দেখা যায় যে জরতোস্ত নামধেয় ছয় জন মহাপুরুষ ভিন্ন ভিন্ন কালে উদয় হইয়াছেন— তাঁহাদের মধ্যে কাহাকে পারসী ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়? যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে বলা যাইতে পারে যে এই জরতোস্ত খৃষ্টাব্দের সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে পারস্য রাজা গুষ্টাস্পের রাজত্ব কালে প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার সময়ে পারসী ধর্ম্ম ঘোরতর পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল তিনি তাহা সংশোধনে ব্রতী হইয়া একেশ্বর-বাদ প্রচার করেন। তিনি যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা প্রাচীন ইরাণী ভাষায় লিখিত ও তাহার নাম অবস্তা। এই সকল গ্রন্থের অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে— অবশিষ্ট অল্পভাগ পারসীদের নিকটে পাওয়া যায় ও তদন্তর্গত মন্ত্রাবলী তাঁহাদের মুখে শ্রবণ করা যায়।

জরতোস্তের উপদেশ এই, ঈশ্বর একমাত্র—সর্ব্বশক্তিমান জগতের স্রষ্টা পাতা সর্ব্ব-সুখদাতা। তিনি জ্ঞান স্বরূপ জ্যোতির জ্যোতি। তিনি পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা পাপের শাস্তা।

তাঁহার নাম অহুরমজ্‌দ্। আশ্চর্য্য এই যে সংস্কৃত ও সংস্কৃত মূলক সমস্ত ভাষায় ঈশ্বরের নাম দিবধাতু (প্রকাশ) হইতে উৎপন্ন—জেন্দ ভাষায় দেব শব্দে অসুর বুঝায়। ঈশ্বর অর্থে অন্য শব্দের প্রয়োগ। জগতে মঙ্গল অমঙ্গল দুই আদ্যশক্তি বিদ্যমান তাহারা অহুর মজ্‌দের অধীনে কার্য্য করিতেছে। মঙ্গল শক্তির নাম স্পেণ্টো মৈন্যুষ তাহাই জ্যোতি ও সৌন্দর্য্যের আকর সমুদয় সুখকারী ও হিতকারী বস্তুর প্রসবিতা। আর অমঙ্গল শক্তি—আঙ্গ্রো মৈন্যুষ সকল অমঙ্গলের আকর—দুঃখ ক্লেশের জনয়িতা—পাপ চিন্তার প্রবর্ত্তক। স্পেণ্টো মৈন্যুষ জীবনদাতা আঙ্গ্রো মৈন্যুষ জীবন সংহর্ত্তা—আলোক একের অন্ধকার অন্যের প্রতিকৃতি। এ উভয় শক্তি যদিও পরস্পর বিরোধী কিন্তু দিবা রাত্রের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ও সৃষ্টি সংরক্ষণ কার্য্যে উভয়েই নিযুক্ত।

জরতোস্ত প্রকৃতির শক্তি অথবা পদার্থ বিশেষে দেবত্ব আরোপ করিয়া তাহার পূজা করিবার বিধান দেন নাই সুতরাং তাঁহার ধর্ম্ম পৌত্তলিকতা দোষে দূষিত নহে। সূর্য্য সেই জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বরের প্রতিরূপ—অগ্নি সেই পবিত্র স্বরূপের প্রকাশক ও স্মরণচিহ্ন বলিয়া অর্চ্চনীয়। কিন্তু মূলে যাহা উন্নত ও পবিত্র তাহার স্রোত কাল সহকারে কলুষিত হইয়া যায়—পারসী ধর্ম্মের অবস্থাও কতক ঐরূপ। জ্ঞানীদের ধর্ম্ম এক, আর অজ্ঞান লোকেরা চিহ্নকে যথার্থ মনে করিয়া লইয়া সূর্য্যের স্তবে প্রবৃত্ত হয়—অগ্নি মন্দিরে অগ্নিকেই দেবতা রূপে পূজা করে।

জরতোস্তের গ্রন্থ সকল নীতিগর্ভ উপদেশে পরিপূর্ণ—তাহার সার তিন কথায় ব্যক্ত হইতে পারে।

হুমাতা, হুখ্‌তা, হ্বরষ্টা অর্থাৎ মনোবাক্‌কার্য্যে পবিত্রতা রক্ষা করিবে। *

পারসী ভিন্ন ইহুদী পোর্ত্তুগীস প্রভৃতি আর কতকগুলি জাতি বোম্বায়ে দৃষ্ট হয় তাহাদের বিবরণ লিখিবার আবশ্যক নাই। এ দেশের পোর্ত্তুগীসদের মধ্যে বিদ্যা সম্পৎ সম্পন্ন নামাঙ্কিত লোক অল্পই। পোর্ত্তুগীস রাজ্যের ভগ্নাবশেষ যে গোওয়া তাহা হইতে অনেক গোওয়ানীস বোম্বায়ে আসিয়া বাস করিতেছে—ইউরোপীয়দিগের রাঁধুনি ও বট্‌লর (খানসামা) এই দল হইতে সংগৃহীত।

---

# রাজর্ষি।

## দ্বিতীয় খণ্ড।

### উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

নির্ব্বাসনোদ্যত রঘুপতিকে যখন প্রহরীরা জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, কোন্‌দিকে যাইবেন?" তখন রঘুপতি উত্তর করিলেন "পশ্চিম দিকে যাইব।"

* History of the Parsees By Dosabhai Framji.

নয় দিন পশ্চিমমুখে যাত্রার পর বন্দী ও প্রহরীরা ঢাকা সহরের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিল। তখন প্রহরীরা রঘুপতিকে ছাড়িয়া দিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিল।

রঘুপতি মনে মনে বলিলেন "কলিতে ব্রহ্মশাপ ফলে না—দেখা যাক্ ব্রাহ্মণের বুদ্ধিতে কতটা হয়! দেখা যাক্, গোবিন্দমাণিক্যই বা কেমন রাজা, আর আমিই বা কেমন পুরোহিত ঠাকুর!"

ত্রিপুরার প্রান্তে মন্দিরের কোণে মোগল রাজ্যের সংবাদ বড় পৌঁছিত না। এই নিমিত্ত রঘুপতি ঢাকা সহরে গিয়া মোগলদিগের রীতি নীতি ও রাজ্যের অবস্থা জানিতে কৌতূহলী হইলেন।

তখন মোগল সম্রাট শাজাহানের রাজত্বকাল। তখন তাঁহার তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজীব দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর আক্রমণে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুজা বাঙ্গালার অধিপতি ছিলেন—রাজমহলে তাঁহার রাজধানী। কনিষ্ঠপুত্র কুমার মুরাদ গুজরাটের শাসনকর্ত্তা। জ্যেষ্ঠ যুবরাজ দারা রাজধানী দিল্লিতেই বাস করিতেছেন। সম্রাটের বয়স ৬৭ বৎসর। তাঁহার শরীর অসুস্থ বলিয়া দারার উপরেই সাম্রাজ্যের ভার পড়িয়াছে।

রঘুপতি কিয়ৎকাল ঢাকায় বাস করিয়া উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করিলেন—ও অবশেষে রাজমহল অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাজমহলে যখন পৌঁছিলেন তখন ভারতবর্ষে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। সংবাদ রাষ্ট্র হইয়াছে যে শাজাহান মৃত্যুশয্যায় শয়ান। এই সংবাদ পাইবামাত্র সুজা সৈন্য সহিত দিল্লি অভিমুখে ধাবমান হইয়াছেন। সম্রাটের চারিপুত্রই মুমূর্ষু সাজাহানের মাথার উপর হইতে মুকুটটা একেবারে ছোঁ মারিয়া উড়াইয়া লইবার উদ্যোগ করিতেছেন।

ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ অরাজক রাজমহল ত্যাগ করিয়া সুজার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সঙ্গে যে দুই লক্ষ টাকা ছিল তাহা রাজমহলের নিকটবর্ত্তী এক বিজন প্রান্তরে পুঁতিয়া ফেলিলেন। তাহার উপরে এক চিহ্ন রাখিয়া চলিয়া গেলেন। অতি অল্প টাকাই সঙ্গে লইলেন। দগ্ধ কুটীর, পরিত্যক্ত গ্রাম, মর্দ্দিত শস্যক্ষেত্র লক্ষ্য করিয়া রঘুপতি অবিশ্রাম অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রঘুপতি সন্যাসীর বেশ ধারণ করিলেন। কিন্তু সন্যাসীর বেশ সত্ত্বেও আতিথ্য পাওয়া দুর্ঘট। কারণ পঙ্গপালের ন্যায় সৈন্যেরা যে পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার উভয়পার্শ্বে কেবল দুর্ভিক্ষ বিরাজ করিতেছে। সৈন্যেরা অশ্ব ও হস্তীপালের জন্য অপক্ক শস্য কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। কৃষকের মরাইয়ে একটি কণা অবশিষ্ট নাই। চারিদিকে কেবল লুণ্ঠনাবশিষ্ট বিশৃঙ্খলা। অধিকাংশ লোক গ্রাম ছাড়িয়া পালাইয়াছে। দৈবাৎ যে দুয়েক জনকে দেখা যায় তাহাদের মুখে হাস্য নাই। তাহারা চকিত হরিণের ন্যায় সতর্ক, কাহাকেও তাহারা বিশ্বাস করে না, দয়া করে না। বিজন পথের পার্শ্বে গাছের তলায় লাঠিহাতে দুইচারি জনকে বসিয়া থাকিতে

দেখা যায়—পথিক শিকারের জন্য তাহারা সমস্ত দিন অপেক্ষা করিয়া আছে। ধূমকেতুর পশ্চাদ্বর্ত্তী উল্কারাশির ন্যায় দস্যুরা সৈনিকদের অনুসরণ করিয়া লুণ্ঠনাবশেষ লুটিয়া লইয়া যায়। এমন কি, মৃত দেহের উপর শৃগাল কুকুরের ন্যায় মাঝে মাঝে সৈন্য দল ও দস্যুদলে লড়াই বাধিয়া যায়। নিষ্ঠুরতা সৈন্যদের খেলা হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী নিরীহ পথিকের পেটে খপ্‌ করিয়া একটা তলোয়ারের খোঁচা বসাইয়া দেওয়া বা তাহার মুণ্ড হইতে পাগ্‌ড়ি সমেত খানিকটা খুলি উড়াইয়া দেওয়া তাহারা উপহাস মাত্র মনে করে। গ্রামের লোকেরা তাহাদের দেখিয়া ভয় পাইতেছে দেখিলে তাহাদের পরম কৌতুক বোধ হয়। লুণ্ঠনাবশেষে তাহারা গ্রামের লোকদের উৎপীড়ন করিয়া আনন্দ উপভোগ করে। দুই জন মান্য ব্রাহ্মণকে পিঠে পিঠে সংলগ্ন করিয়া টিকিতে টিকিতে বাঁধিয়া উভয়ের নাকে নস্য প্রয়োগ করে। দুই ঘোড়ার পিঠে এক জন মানুষকে চড়াইয়া ঘোড়া দুটাকে চাবুক মারে ঘোড়া দুটা দুই বিপরীত দিকে ছুটিয়া যায়, মাঝখানে মানুষটা পড়িয়া গিয়া হাত পা ভাঙ্গে। এইরূপ প্রতিদিন নূতন নূতন খেলা তাহারা আবিষ্কার করে। লুণ্ঠনাবশেষে অকারণে গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়া যায়। বলে যে বাদ-শাহের সম্মানার্থে বাজি পুড়াইতেছে। সৈন্যদের পথে এইরূপ অত্যাচারের শত শত চিহ্ন পড়িয়া আছে। এখানে রঘুপতি আতিথ্য পাইবেন কোথায়! কোন দিন অনা-হারে কোন দিন স্বল্পাহারে দিন যাইতে লাগিল। রাত্রে অন্ধকারে এক ভগ্ন পরিত্যক্ত কুটীরে শ্রান্তদেহে শয়ন করিয়াছিলেন, সকালে উঠিয়া দেখেন এক ছিন্নশির মৃতদেহকে সমস্তরাত্রি বালিশ করিয়া শুইয়াছিলেন। একদিন মধ্যাহ্নে রঘুপতি ক্ষুধিত হইয়া কোন কুটীরে গিয়া দেখিলেন একজন লোক তাহার ভাঙ্গা খোলা সিন্ধুকের উপরে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া আছে, বোধ হয় তাহার লুণ্ঠিত ধনের জন্য শোক করিতেছিল, কাছে গিয়া ঠেলিতেই সে গড়াইয়া পড়িয়া গেল। মৃত দেহ মাত্র—তাহার জীবন অনেককাল হইল চলিয়া গিয়াছে।

একদিন রঘুপতি এক কুটীরে শুইয়া আছেন।—রাত্রি অবসান হয় নাই। প্রহর-খানেক বিলম্ব আছে। এমন সময়ে ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া গেল। শরতের চন্দ্রা-লোকের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি ছায়া ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িল। ফিস্ ফিস্ শব্দ শুনা গেল। রঘুপতি চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন। তিনি উঠিতেই কতকগুলি স্ত্রীকণ্ঠ সভয়ে বলিয়া উঠিল—"ও মা গো!" একজন পুরুষ অগ্রসর হইয়া বলিল—"কোন্ হ্যায় রে!"

রঘুপতি কহিলেন "আমি ব্রাহ্মণ, পথিক। তোমরা কে?"

"আমাদের এই ঘর। আমরা ঘর ছাড়িয়া পালাইয়াছিলাম। মোগল সৈন্য চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া তবে এখানে আসিয়াছি।"

রঘুপতি জিজ্ঞাসা করিলেন "মোগল সৈন্য কোন্‌দিকে গিয়াছে।"

তাহারা কহিল "বিজয় গড়ের দিকে। এতক্ষণ বিজয় গড়ের বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।"

রঘুপতি আর অধিক কিছু না বলিয়া তৎক্ষণাৎ যাত্রা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

## বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিজয়গড়ের দীর্ঘ বন ঠগীদের আড্ডা। বনের মধ্যে দিয়া যে পথ গিয়াছে, সেই পথের দুই পার্শ্বে কত মনুষ্য কঙ্কাল নিহিত আছে, তাহাদের উপরে কেবল বনফুল ফুটিতেছে, আর কোন চিহ্ন নাই। বনের মধ্যে বট আছে, বাব্‌লা আছে, নীম আছে, শত শত প্রকারের লতা ও গুল্ম আছে। স্থানে স্থানে ডোবা অথবা পুকুরের মত দেখা যায়। অবিশ্রাম পাতা পচিয়া পচিয়া তাহার জল একেবারে সবুজ হইয়া উঠিয়াছে। ছোট ছোট সুঁড়ি পথ এদিকে ওদিকে আঁকিয়া বাঁকিয়া সাপের মত অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। গাছের ডালে ডালে পালে পালে হনুমান। বটগাছের ডালের উপর হইতে শত শত শিকড় এবং হনুমানের লেজ ঝুলিতেছে। ভাঙ্গা মন্দিরের প্রাঙ্গনে শিউলি ফুলের গাছ শাদা শাদা ফুলে এবং হনুমানের দন্ত বিকাশে একবারে আচ্ছন্ন। সন্ধ্যাবেলায় বড় বড় ঝাঁকড়া গাছের উপরে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া পাখীর চীৎকারে অন্ধকার বনের ঘোর অন্ধকার যেন দীর্ণ বিদীর্ণ হইতে থাকে। আজ এই বৃহৎ বনের মধ্যে প্রায় কুড়িহাজার সৈন্য প্রবেশ করিয়াছে। এই ডালে পালায় লতায় পাতায় তৃণে গুল্মে জড়িত বৃহৎ গোলাকার অরণ্য, কুড়ি হাজার খর-নখ-চঞ্চু সৈনিক বাজপক্ষীদের একটি-মাত্র নীড় বলিয়া বোধ হইতেছে। সৈন্য সমাগম দেখিয়া অসংখ্য কাক কা কা করিয়া দল বাঁধিয়া আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে—সাহস করিয়া ডালের উপর আসিয়া বসিতেছে না। কোন প্রকার গোলমাল করিতে সেনাপতির নিষেধ আছে। সৈন্যেরা সমস্ত দিন চলিয়া সন্ধ্যাবেলায় বনে আসিয়া শুষ্ককাঠ কুড়াইয়া রন্ধন করিতেছে ও পরস্পর চুপি চুপি কথা কহিতেছে—তাহাদের সেই গুন্ গুন্ শব্দে সমস্ত অরণ্য গম্‌গম্ করিতেছে, সন্ধ্যাবেলার ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাইতেছে না। গাছের গুঁড়িতে বাঁধা অশ্বেরা মাঝে মাঝে খুর দিয়া মাটি খুঁড়িতেছে ও হ্রেষাধ্বনি করিয়া উঠিতেছে—সমস্ত বনের তাহাতে চমক লাগিতেছে। ভাঙ্গা মন্দিরের কাছে ফাঁকা জায়গায় শা সুজার শিবির পড়িয়াছে। আর সকলের আজ বৃক্ষতলেই অবস্থান।

সমস্তদিন অবিশ্রাম চলিয়া রঘুপতি যখন বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন রাত্রি হইয়াছে। অধিকাংশ সৈন্য নিস্তব্ধে ঘুমাইতেছে, অল্প মাত্র সৈন্য নীরবে পাহারা দিতেছে। মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় আগুন জ্বলিতেছে—অন্ধকার যেন ঘুমন্ত রাঙা চক্ষু মেলিয়াছে। রঘুপতি বনের মধ্যে পা দিয়াই কুড়িহাজার সৈনিকের নিশ্বাস প্রশ্বাস যেন শুনিতে পাইলেন। বনের সহস্র গাছ শাখা বিস্তার করিয়া পাহারা দিতেছে।

কালপেচক তাহার সদ্যোজাত শাবকের উপরে যেমন পক্ষ প্রসারিত করিয়া বসিয়া থাকে, তেমনি অরণ্যের বাহিরকার বিরাট রাত্রি অরণ্যের ভিতরকার গাঢ়তর রাত্রির উপর চাপিয়া ডানা ঝাঁপিয়া নীরবে বসিয়া আছে—অরণ্যের ভিতরে একরাত্রি মুখ গুঁজিয়া ঘুমাইয়া আছে, অরণ্যের বাহিরে একরাত্রি মাথা তুলিয়া জাগিয়া আছে। রঘুপতি সে রাত্রে বনপ্রান্তে শুইয়া রহিলেন।

সকালে গোটাছুইচার খোঁচা খাইয়া ধড়্ফড় করিয়া জাগিয়া উঠিলেন। দেখিলেন জনকত পাগড়ি-বাঁধা দাড়িপরিপূর্ণ তুরাণী সৈন্য বিদেশী ভাষায় তাঁহাকে কি বলিতেছে, শুনিয়া তিনি নিশ্চয় অনুমান করিয়া লইলেন গালি। তিনিও বঙ্গভাষায় তাহাদের শ্যালক সম্বন্ধ প্রচার করিয়া দিলেন। তাহারা তাঁহাকে টানাটানি করিতে লাগিল। রঘুপতি বলিলেন ঠাট্টা পেয়েছিস্ না কি?" কিন্তু তাহাদের আচরণে ঠাট্টার লক্ষণ কিছুমাত্র প্রকাশ পাইল না। বনের মধ্যদিয়া তাহারা তাঁহাকে অকাতরে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। তিনি সবিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন— "আরে, টানাটানি করিস্ কেন? আমি আপনিই যাচ্চি। এত পথ আমি এলুম কি করতে?" সৈন্যেরা হাসিতে লাগিল ও তাঁহার বাঙ্গলা কথা নকল করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিস্তর সৈন্য জড় হইল, তাঁহাকে লইয়া ভারি গোল পড়িয়া গেল। উৎপীড়নেরও সীমা রহিল না। একজন সৈন্য একটা কাঠবিড়ালীর লেজ ধরিয়া তাঁহার মুণ্ডিত মাথায় ছাড়িয়া দিল—দেখিবার ইচ্ছা, ফল মনে করিয়া খায় কি না। এক জন সৈন্য তাঁহার নাকের সম্মুখে একটা মোটা বেত বাঁকাইয়া ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল, সেটা ছাড়িয়া দিলে রঘুপতির মুখের উপর হইতে নাকের সমুন্নত মহিমা একেবারে সমূলে লোপ হইবার সম্ভাবনা। সৈন্যদের হাস্যে কানন ধ্বনিত হইতে লাগিল। মধ্যাহ্নে আজ যুদ্ধ করিতে হইবে, সকালে তাই রঘুপতিকে লইয়া তাহাদের ভারি খেলা পড়িয়া গেল। খেলার সাধ মিটিলে পর ব্রাহ্মণকে সুজার শিবিরে লইয়া গেল।

সুজাকে দেখিয়া রঘুপতি সেলাম করিলেন না, তিনি দেবতা ও স্ববর্ণ ছাড়া আর কাহারও কাছে কখনও মাথা নত করেন নাই। মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন— হাত তুলিয়া বলিলেন "শাহেন শার জয় হউক্!" সুজা মদের পেয়ালা লইয়া সভাসদ সমেত বসিয়া ছিলেন; আলস্য-বিজড়িত স্বরে নিতান্ত উপেক্ষা ভরে কহিলেন—"কি, ব্যাপার কি?"

সৈন্যেরা কহিল "জনাব, শত্রুপক্ষের চর গোপনে আমাদের বলাবল জানিতে আসিয়াছিল, আমরা তাহাকে প্রভুর কাছে ধরিয়া আনিয়াছি।"

সুজা কহিলেন "আচ্ছা আচ্ছা; বেচারা দেখিতে আসিয়াছে, উহাকে ভাল করিয়া সমস্ত দেখাইয়া ছাড়িয়া দাও। দেশে গিয়া গল্প করিবে।"

রঘুপতি বদ্ হিন্দুস্থানীতে কহিলেন "সরকারের অধীনে আমি কর্ম্ম প্রার্থনা করি।"

সুজা আলস্য ভরে হাত নাড়িয়া তাঁহাকে দ্রুত চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। বলিলেন "গরম।" যে বাতাস করিতেছিল, সে দ্বিগুণ জোরে বাতাস করিতে লাগিল।

দারা তাঁহার পুত্র সুলেমানকে রাজা জয়সিংহের অধীনে সুজার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পাঠাইয়াছেন। তাঁহাদের বৃহৎ সৈন্যদল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, সংবাদ আসিয়াছে। তাই বিজয়গড়ের কেল্লা অধিকার করিয়া সেইখানে সৈন্য সমবেত করিবার জন্য সুজা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সুজার হাতে কেল্লা এবং সরকারী খাজানা সমর্পণ করিবার প্রস্তাব লইয়া বিজয়গড়ের অধিপতি বিক্রমসিংহের নিকট দূত গিয়াছিল। বিক্রমসিংহ সেই দূতমুখে বলিয়া পাঠাইলেন—"আমি কেবল দিল্লীশ্বর শাজাহান এবং জগদীশ্বর ভবানীপতিকে জানি, সুজা কে? আমি তাহাকে জানি না।"

সুজা জড়িতস্বরে কহিলেন—"ভারি বেয়াদব! নাহক্ আবার লড়াই করিতে হইবে! ভারি হাঙ্গাম!"

রঘুপতি এই সমস্ত শুনিতে পাইলেন। সৈন্যদের হাত এড়াইবামাত্র বিজয়গড়ের দিকে চলিয়া গেলেন।

## একবিংশ পরিচ্ছেদ।

পাহাড়ের উপরে বিজয়গড়। বিজয়গড়ের অরণ্য গড়ের কাছাকাছি গিয়া শেষ হইয়াছে। অরণ্য হইতে বাহির হইয়া রঘুপতি সহসা দেখিলেন দীর্ঘ পাষাণ দুর্গ যেন নীল আকাশে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অরণ্য যেমন তাহার সহস্র তরুজালে আচ্ছন্ন, দুর্গ তেমনি আপনার পাষাণের মধ্যে আপনি রুদ্ধ। অরণ্য সাবধানী, দুর্গ সতর্ক। অরণ্য ব্যাঘ্রের মত গুঁড়ি মারিয়া লেজ পাকাইয়া বসিয়া আছে, দুর্গ সিংহের মত কেশর ফুলাইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অরণ্য কান পাতিয়া শুনিতেছে, দুর্গ মাথা তুলিয়া দেখিতেছে।

রঘুপতি অরণ্য হইতে বাহির হইবামাত্র দুর্গপ্রাকারের উপরে সৈন্যেরা সচকিত হইয়া উঠিল। শৃঙ্গ বাজিয়া উঠিল। দুর্গ যেন সহসা সিংহনাদ করিয়া দাঁত নখ মেলিয়া ভ্রূকুটি করিয়া দাঁড়াইল। রঘুপতি পৈতা দেখাইয়া হাত তুলিয়া ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। সৈন্যেরা সতর্ক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রঘুপতি যখন দুর্গ-প্রাচীরের কাছাকাছি গেলেন, তখন সৈন্যেরা জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল "তুমি কে?" রঘুপতি বলিলেন "আমি ব্রাহ্মণ, অতিথি।"

দুর্গাধিপতি বিক্রমসিংহ পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ। দেবতা ব্রাহ্মণ ও অতিথি সেবায় নিযুক্ত। পৈতা থাকিলে দুর্গ প্রবেশের জন্য আর কোন পরিচয়ের আবশ্যক ছিল না। কিন্তু আজ যুদ্ধের দিনে কি করা উচিত সৈন্যেরা ভাবিয়া পাইতেছিল না। রঘুপতি

কহিলেন "তোমরা আশ্রয় না দিলে মুসলমানদের হাতে আমাকে মরিতে হইবে।" বিক্রমসিংহের কানে যখন এ কথা গেল তখন তিনি ব্রাহ্মণকে দুর্গের মধ্যে আশ্রয় দিতে অনুমতি করিলেন। প্রাচীরের উপর হইতে একটা মই নামান' হইল, রঘুপতি দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দুর্গের মধ্যে যুদ্ধের প্রতীক্ষায় সকলেই নিতান্ত ব্যস্ত। বৃদ্ধ খুড়া সাহেব ব্রাহ্মণ অভ্যর্থনার ভার স্বয়ং লইলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম খড়্গ সিং কিন্তু তাঁহাকে কেহ বলে খুড়াসাহেব, কেহ বলে সুবাদার সাহেব—কেন যে বলে তাহার কোন কারণ পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নাই, ভাই নাই, তাঁহার খুড়া হইবার কোন অধিকার বা সুদূর সম্ভাবনা নাই—এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র যতগুলি তাঁহার সুবা তাহার অপেক্ষা অধিক নহে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহ তাঁহার উপাধি সম্বন্ধে কোন প্রকার আপত্তি অথবা সন্দেহ উত্থাপিত করে নাই। যাহারা বিনা ভাইপোয় খুড়া, বিনা সুবায় সুবাদার, সংসারের অনিত্যতা ও লক্ষ্মীর চপলতা নিবন্ধন তাহাদের পদচ্যুতির কোন আশঙ্কা নাই।

খুড়াসাহেব আসিয়া কহিলেন "বাহবা, এইত ব্রাহ্মণ বটে!" বলিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। রঘুপতির একপ্রকার তেজিয়ান দীপ্তশিখার মত আকৃতি ছিল, যাহা দেখিয়া সহসা পতঙ্গেরা মুগ্ধ হইয়া যাইত।

খুড়াসাহেব জগতের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায় বিষণ্ণ হইয়া কহিলেন "ঠাকুর, তেমন ব্রাহ্মণ আজ কাল ক'টা মেলে!"

রঘুপতি কহিলেন "অতি অল্প।"

খুড়াসাহেব কহিলেন "আগে ব্রাহ্মণের মুখে অগ্নি ছিল এখন সমস্ত অগ্নি জঠরে আশ্রয় লইয়াছে।"

রঘুপতি কহিলেন "তাও কি আগেকার মত আছে!"

খুড়াসাহেব মাথা নাড়িয়া কহিলেন "ঠিক কথা! অগস্ত্যমুনি যে আন্দাজ পান করিয়াছিলেন সে আন্দাজ যদি আহার করিতেন তাহা হইলে একবার বুঝিয়া দেখুন।"

রঘুপতি কহিলেন "আরও দৃষ্টান্ত আছে।"

খুড়াসাহেব—"হাঁ আছে বৈ কি! জহ্নু মুনির পিপাসার কথা শুনা যায় তাঁহার ক্ষুধার কথা কোথাও লেখে নাই কিন্তু একটা অনুমান করা যাইতে পারে। হর্ত্তকী খাইলেই যে কম খাওয়া হয় তাহা নহে, ক'টা করিয়া হর্ত্তুকী তাঁহারা রোজ খাইতেন তাহার একটা হিসাব থাকিলে তবু বুঝিতে পারিতাম।"

রঘুপতি ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন "না সাহেব, আহারের প্রতি তাঁহাদের যথেষ্ট মনোযোগ ছিল না!"

খুড়াসাহেব জিভ কাটিয়া কহিলেন "রাম রাম, বলেন কি ঠাকুর! তাঁহাদের জঠরানল

যে অত্যন্ত প্রবল ছিল তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। দেখুন্ না কেন, কালক্রমে আর সকল অগ্নিই নিবিয়া গেল, হোমের অগ্নিও আর জলে না, কিন্তু”—

রঘুপতি কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন “হোমের অগ্নি আর জ্বলিবে কি করিয়া? দেশে ঘি রহিল কই? পাষণ্ডেরা সমস্ত গরু পার করিয়া দিতেছে, এখন হব্য পাওয়া যায় কোথায়? হোমাগ্নি না জ্বলিলে ব্রহ্মতেজ আর কতদিন টেঁকে!” বলিয়া রঘুপতি নিজের প্রচ্ছন্ন দাহিকাশক্তি অত্যন্ত অনুভব করিতে লাগিলেন।

খুড়াসাহেব কহিলেন “ঠিক বলিয়াছেন ঠাকুর, গরুগুলো মরিয়া আজকাল মনুষ্য-লোকে জন্মগ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের কাছ হইতে ঘি পাইবার প্রত্যাশা করা যায় না—মগজের সম্পূর্ণ অভাব! ঠাকুরের কোথা হইতে আসা হইতেছে!”

রঘুপতি কহিলেন “ত্রিপুরার রাজবাটি হইতে।”

বিজয়গড়ের বহিঃস্থিত ভারতবর্ষের ভূগোল অথবা ইতিহাস সম্বন্ধে খুড়াসাহেবের অতি যৎসামান্য জানা ছিল। বিজয়গড় ছাড়া ভারতবর্ষে জানিবার যোগ্য যে আর কিছু আছে তাহাও তাঁহার বিশ্বাস নহে। সম্পূর্ণ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলিলেন “আহা, ত্রিপুরার রাজা মস্ত রাজা।”

রঘুপতি তাঁহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন।

খুড়াসাহেব—“ঠাকুরের কি করা হয়?”

রঘুপতি “আমি ত্রিপুরার রাজপুরোহিত।”

খুড়াসাহেব চোখ বুজিয়া মাথা নাড়িয়া কহিলেন “আহা!” রঘুপতির উপরে তাঁহার ভক্তি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। “কি করিতে আসা হইয়াছে!”

রঘুপতি কহিলেন “তীর্থ দর্শন করিতে!”

“ধুম্” করিয়া আওয়াজ হইল। শত্রুপক্ষ দুর্গ আক্রমণ করিয়াছে। খুড়াসাহেব হাসিয়া চোখ টিপিয়া কহিলেন—“ও কিছু নয়, ঢেলা ছুঁড়িতেছে।” বিজয়গড়ের উপরে খুড়াসাহেবের বিশ্বাস যত দৃঢ় বিজয়গড়ের পাষাণ তত দৃঢ় নহে। বিদেশী পথিক দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিলেই খুড়াসাহেব তাহাকে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া বসেন এবং বিজয়-গড়ের মাহাত্ম্য তাহার মনে বদ্ধমূল করিয়া দেন। ত্রিপুরার রাজবাটি হইতে রঘুপতি আসিয়াছেন; এমন অতিথি সচরাচর মেলে না, খুড়াসাহেব অত্যন্ত উল্লাসে আছেন। অতিথির সঙ্গে বিজয়গড়ের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, ব্রহ্মার অণ্ড এবং বিজয়গড়ের দুর্গ যে প্রায় একই সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ঠিক মনুর পর হইতেই মহারাজ বিক্রমসিংহের পূর্ব্বপুরুষেরা যে এই দুর্গ ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন সে বিষয়ে কোন পণ্ডিতের কোন সংশয় থাকিতে পারে না। এই দুর্গের প্রতি শিবের কি বর আছে, এবং এই দুর্গে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন যে কিরূপে বন্দী হইয়াছিলেন তাহাও রঘুপতির অগোচর রহিল না।

সন্ধ্যার সময়ে সংবাদ পাওয়া গেল শত্রুপক্ষ দুর্গের কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। তাহারা কামান পাতিয়াছিল কিন্তু কামানের গোলা দুর্গে আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। খুড়াসাহেব হাসিয়া রঘুপতির দিকে চাহিলেন। মর্ম্ম এই যে, দুর্গের প্রতি শিবের যে অমোঘ বর আছে তাহার এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কি হইতে পারে। বোধ করি, নন্দী স্বয়ং আসিয়া কামানের গোলাগুলো লুফিয়া লইয়া গিয়াছে কৈলাসে গণপতি ও কার্ত্তিকেয় ভাঁটা খেলিবেন।

## দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

শাসুজাকে কোন মতে হস্তগত করাই রঘুপতির উদ্দেশ্য ছিল। তিনি যখন শুনিলেন সুজা দুর্গ আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখন মনে করিলেন মিত্রভাবে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি কোন রূপে সুজার দুর্গ আক্রমণে সাহায্য করিবেন—কিন্তু ব্রাহ্মণ যুদ্ধ বিগ্রহের কোন ধার ধারেন না, কি করিলে যে সুজার সাহায্য হইতে পারে কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না।

পরদিন আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বিপক্ষ পক্ষ বারুদ দিয়া দুর্গ-প্রাচীরের কিয়দংশ উড়াইয়া দিল, কিন্তু ঘন ঘন গুলি বর্ষণের প্রভাবে দুর্গে প্রবেশ করিতে পারিল না। ভগ্ন অংশ দেখিতে দেখিতে গাঁথিয়া তোলা হইল। আজ মাঝে মাঝে দুর্গের মধ্যে গোলাগুলি আসিয়া পড়িতে লাগিল, দুই চারি জন করিয়া দুর্গ সৈন্য হত ও আহত হইতে লাগিল।

"ঠাকুর, কিছু ভয় নাই, এ কেবল খেলা হইতেছে" বলিয়া খুড়া সাহেব রঘুপতিকে লইয়া দুর্গের চারিদিক দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কোথায় অস্ত্রাগার, কোথায় ভাণ্ডার, কোথায় আহতদের চিকিৎসাগৃহ, কোথায় বন্দীশালা, কোথায় দরবার, এই সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইতে লাগিলেন ও বারবার রঘুপতির মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। রঘুপতি কহিলেন "চমৎকার কারখানা! ত্রিপুরার গড় ইহার কাছে লাগিতে পারে না। কিন্তু সাহেব, গোপনে পলায়নের জন্য ত্রিপুরার গড়ে একটি আশ্চর্য্য সুরঙ্গ পথ আছে, এখানে সেরূপ কিছুই দেখিতেছি না!"

খুড়াসাহেব কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, সহসা আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন "না এ দুর্গে সেরূপ কিছুই নাই।"

রঘুপতি নিতান্ত আশ্চর্য্য প্রকাশ করিয়া কহিলেন "এত বড় দুর্গে একটা সুরঙ্গ পথ নাই, এ কেমন কথা হইল!"

খুড়াসাহেব কিছু কাতর হইয়া কহিলেন "নাই, এ কি হইতে পারে? অবশ্যই আছে, তবে আমরা হয়ত কেহ জানি না!"

রঘুপতি হাসিয়া কহিলেন "তবে ত না থাকারই মধ্যে। যখন আপনিই জানেন না তখন আর কেই বা জানে ?"

খুড়াসাহেব অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তার পরে সহসা "হরি হে রাম রাম" বলিয়া তুড়ি দিয়া হাই তুলিলেন, তার পরে মুখে গোঁফে দাড়িতে দুই একবার হাত বুলাইয়া হঠাৎ বলিলেন "ঠাকুর, আপনি পূজা অর্চ্চনা লইয়া থাকেন আপনাকে বলিতে কোন দোষ নাই—দুর্গ প্রবেশের এবং দুর্গ হইতে বাহির হইবার দুইটা গোপন পথ আছে, কিন্তু বাহিরের কোন লোককে তাহা দেখান' নিষেধ।"

রঘুপতি কিঞ্চিৎ সন্দেহের স্বরে কহিলেন "বটে! তা হবে!"

খুড়াসাহেব দেখিলেন তাঁহারই দোষ, একবার "নাই" একবার "আছে" বলিলে লোকের স্বভাবতই সন্দেহ হইতে পারে। বিদেশীর চোখে ত্রিপুরার গড়ের কাছে বিজয়-গড় কোন অংশে খাটো হইয়া যাইবে ইহা খুড়াসাহেবের পক্ষে অসহ্য।

তিনি কহিলেন "ঠাকুর, বোধ করি, আপনার ত্রিপুরা অনেক দূরে এবং আপনি ব্রাহ্মণ, দেবসেবাই আপনার একমাত্র কাজ, আপনার দ্বারা কিছুই প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই!"

রঘুপতি কহিলেন "কাজ কি সাহেব, সন্দেহ হয় ত ও সব কথা থাক্ না! আমি ব্রাহ্মণের ছেলে আমার দুর্গের খবরে কাজ কি!"

খুড়াসাহেব জিভ কাটিয়া কহিলেন "আরে রাম রাম, আপনাকে আবার সন্দেহ কিসের! চলুন্ একবার দেখাইয়া লইয়া আসি!"

এদিকে সহসা দুর্গের বাহিরে সুজার সেনাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। অরণ্যের মধ্যে সুজার শিবির ছিল, সুলেমান এবং জয়সিংহের সৈন্য আসিয়া সহসা তাঁহাকে বন্দী করিয়াছে, এবং অলক্ষ্যে দুর্গ-আক্রমণকারীদের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। সুজার সৈন্যেরা লড়াই না করিয়া কুড়িটা কামান পশ্চাতে ফেলিয়া ভঙ্গ দিল।

দুর্গের মধ্যে ধুম পড়িয়া গেল। বিক্রম সিংহের নিকট সুলেমানের দূত পৌঁছিতেই তিনি দুর্গের দ্বার খুলিয়া দিলেন। স্বয়ং অগ্রসর হইয়া সুলেমান ও রাজা জয়সিংহকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। দিল্লীশ্বরের সৈন্য ও অশ্ব গজে দুর্গ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। নিশান উড়িতে লাগিল, শঙ্খ ও রণবাদ্য বাজিতে লাগিল এবং খুড়াসাহেবের শ্বেত গুম্ফের নীচে শ্বেত হাস্য পরিপূর্ণ রূপে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

---

# স্নেহের পুতলি।

১

শত চুমো খেয়ে মুখে
মেটে না প্রাণের তৃষা,
গান গেয়ে তারে লয়ে
পূরিবে কি ভালবাসা!

২

কি গান গাহিব আমি,—
কোথারে পাইবি আশা
কুসুমে গঠিত বাণী,
তারকা-ফুটান ভাষা!

৩

বসন্তের কুহু—কুহু—
পরাণ-জীয়ান বাণী,
জোছনা-উতলা বায়ু
শোনে যাহা ফুল রাণী,

৪

মধুর প্রেমেতে গলে,
তারাও ধরিলে তান,
একটি হাঁসিতে তার
ছুটিয়ে পলায় গান॥

৫

কি তবে করিব আমি?
কোথায় পাইব ভাষা?
কি দিয়ে রচিব সুর?
দরিদ্র এ ভালবাসা!

৬

প্রেমের চাঁদিনী মাখা
চুমোর মন্দার হার—

তাও যদি হার মানে
গান তবে কেন আর?

৭

গানের মূরতি সে যে—
ত্রিদিবে উঠিছে স্বর;
হাঁসিতে জোছানা ভাষে—
মন্দাকিনী তরপুর!

৮

আলোর মূরতি সে যে,
বসন্তের বাস পরা,
আকাশ ধরিছে করে,
দুটি পদে ছায় ধরা।

৯

কাহারে নাহিক ভয়,
সবাই আপন তার,
চাঁদে ডাকে হাত তুলে,
স্বপ্নে খোলে স্বর্গ-দ্বার।

১০

তালি দেয় মেঘ-রবে,
বাতাসের পাছু ছোটে,
পড়িলে বৃষ্টির ধারা
সাড়া দিয়ে নেচে ওঠে।

১১

সকলেই সাথী তার,
আপনে আপনি মাতে;—
ধরিবারে নিজ ছায়া
ব্যাকুল চাঁদিনী রাতে।

১২

কার প্রতি দ্বেষ নাই
মমতা সবার সাথ।—
কি জানি কিসের তরে
ভিজে এল আঁখিপাত।

১৩

আকুল ব্যাকুল প্রাণ
কোথা তুই দেরে সাড়া,
পাখী ফুল খেলা ছেড়ে
আয় বাছা কাছে দাঁড়া।

১৪

পুলকে শিহরে তনু—
ধরেছে যাপটি মোরে
গান তবে থেমে থাক্
চুমো খাই প্রাণ ভরে।

---

# পথপ্রান্তে।

আমি পথের ধারে বসিয়া লিখি, তাই কি লিখি ভাবিয়া পাই না।

ছায়াময় পথ। প্রান্তে আমার ক্ষুদ্র গৃহ। তাহার বাতায়ন উন্মুক্ত। ভোরের বেলায় সূর্য্যের প্রথম কিরণ অশোক শাখার কম্পমান ছায়ার সঙ্গে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, আমাকে দেখে, আমার কোলের উপর পড়িয়া খেলা করে, আমার লেখার উপর আসিয়া পড়ে, এবং যখন চলিয়া যায় তখন লেখার উপরে খানিকটা সোনালি রঙ রাখিয়া দিয়া যায়, আমার লেখার উপরে তাহার কনক চুম্বনের চিহ্ণ থাকিয়া যায়। আমার লেখার চারিধারে প্রভাত ফুটিয়া উঠে। মাঠের ফুল, মেঘের রং, ভোরের বাতাস এবং একটুখানি ঘুমের ঘোর আমার পাতার মধ্যে মিশাইয়া থাকে, অরুণের প্রেম আমার অক্ষরগুলির চারিদিকে লতাইয়া উঠে।

আমার সমুখ দিয়া কত লোক আসে কত লোক যায়। প্রভাতের আলো তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিতেছে, স্নেহভরে বলিতেছে তোমাদের যাত্রা শুভ্র হউক, পাখীরা কল্যাণ-গান করিতেছে, পথের আশে পাশে ফুট'-ফুট' ফুলেরা আশার মত ফুটিয়া উঠিতেছে। যাত্রা-আরম্ভের সময়ে সকলে বলিতেছে ভয় নাই ভয় নাই। প্রভাতে সমস্ত বিশ্বজগৎ শুভ-যাত্রার গান গাহিতেছে। অনন্ত নীলিমার উপর দিয়া সূর্য্যের জ্যোতির্ম্ময় রথ ছুটি-য়াছে। নিখিল চরাচর যেন এই মাত্র বিশ্বেশ্বরের জয়ধ্বনি করিয়া বাহির হইল। সহাস্য প্রভাত আকাশে বাহু বিস্তার করিয়া আছে, অনন্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া জগৎকে পথ দেখাইয়া দিতেছে। প্রভাত, জগতের আশা, আশ্বাস, প্রতিদিবসের নান্দী। প্রতিদিন সে পূর্ব্বের কনকদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া জগতে স্বর্গ হইতে মঙ্গল-

বার্ত্তা আনিয়া দেয়, সমস্ত দিনের মত অমৃত আহরণ করিয়া আনে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে নন্দনের পারিজাতের গন্ধ আসিয়া পৃথিবীর ফুলের গন্ধ জাগাইয়া তোলে। প্রভাত জগতের যাত্রা-আরম্ভের আশার্ব্বাদ—সে আশীর্ব্বাদ মিথ্যা নহে।

আমার লেখার উপরে ছায়া ফেলিয়া পৃথিবীর লোক পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। তাহারা সঙ্গে কিছুই লইয়া যায় না। তাহারা সুখ দুঃখ ভুলিতে ভুলিতে চলিয়া যায়। জীবন হইতে প্রতি নিমেষের ভার ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া যায়। তাহাদের হাসি-কান্না আমার লেখার উপরে পড়িয়া অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। তাহাদের গান তাহারা ভুলিয়া যায়, তাহাদের প্রেম তাহারা রাখিয়া যায়।

আর কিছুই থাকে না কিন্তু প্রেম তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। তাহারা সমস্ত পথ কেবল ভাল বাসিতে বাসিতে চলে। পথের যেখানেই তাহারা পা ফেলে সেইখানটুকুই তাহারা ভালবাসে। সেইখানেই তাহারা চিহ্ন রাখিয়া যাইতে চায়—তাহাদের বিদায়ের অশ্রু জলে সে জায়গাটুকু উর্ব্বরা হইয়া উঠে। তাহাদের পথের দুই পার্শ্বে নূতন নূতন ফুল নূতন নূতন তারা ফুটিয়া থাকে। নূতন নূতন পথিকদিগকে তাহারা ভাল বাসিতে বাসিতে অগ্রসর হয়। প্রেমের টানে তাহারা চলিয়া যায়; প্রেমের প্রভাবে তাহাদের প্রতি পদক্ষেপের শ্রান্তি দূর হইয়া যায়। জননীর স্নেহের ন্যায় জগতের শোভা সমস্ত পথ তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে, হৃদয়ের অন্ধকার অন্তঃপুর হইতে তাহাদিগকে বাহিরে ডাকিয়া আনে, পশ্চাৎ হইতে সম্মুখের দিকে তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া লইয়া যায়।

প্রেম যদি কেহ বাঁধিয়া রাখিতে পারিত তবে পথিকদের যাত্রা বন্ধ হইত। প্রেমের যদি কোথাও সমাধি হইত, তবে পথিক সেই সমাধির উপরে জড়পাষাণের মত চিহ্নের স্বরূপ পড়িয়া থাকিত। নৌকার গুণ যেমন নৌকাকে বাঁধিয়া লইয়া যায়, যথার্থ প্রেম তেমনি কাহাকেও বাঁধিয়া রাখিয়া দেয় না, কিন্তু বাঁধিয়া লইয়া যায়। প্রেমের বন্ধনের টানে আর সমস্ত বন্ধন ছিঁড়িয়া যায়। বৃহৎ প্রেমের প্রভাবে ক্ষুদ্র প্রেমের সূত্র সকল টুটিয়া যায়। জগৎ তাই চলিতেছে নহিলে আপনার ভারে আপনি অচল হইয়া পড়িত।

পথিকেরা যখন চলে আমি বাতায়ন হইতে তাহাদের হাসি দেখি, কান্না শুনি। যে প্রেম কাঁদায় সেই প্রেমই আবার চোখের জল মুছাইয়া দেয়, হাসির আলো ফুটাইয়া তোলে। হাসিতে অশ্রুতে, আলোতে বৃষ্টিতে আমাদের চারিদিকে সৌন্দর্য্যের উপবন প্রফুল্ল করিয়া রাখে। প্রেম কাহাকেও চিরদিন কাঁদিতে দেয় না। যে প্রেম একের বিরহে তোমাকে কাঁদায় সেই প্রেমই আর পাঁচকে তোমার কাছে আনিয়া দেয়—প্রেম বলে, "একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ, যে গেছে ইহারা তাহার অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নহে।" কিন্তু তুমি অশ্রুজলে অন্ধ, তুমি আর কাহাকেও দেখিতে পাও না; তাই

ভাল বাসিতে পার না। তুমি তখন মরিতে চাও, সংসারের কাজ করিতে পার না। তুমি পিছন ফিরিয়া বসিয়া থাক, জগতে যাত্রা করিতে চাও না। কিন্তু অবশেষে প্রেমের জয় হয়, প্রেম তোমাকে টানিয়া লইয়া যায়, তুমি মৃত্যুর উপরে মুখ গুঁজিয়া চিরদিন পড়িয়া থাকিতে পার না।

প্রভাতে যাহারা প্রফুল্ল হৃদয়ে যাত্রা করিয়া বাহির হয় তাহাদিগকে অনেক দূরে যাইতে হইবে। অনেক—অনেক দূর। পথের উপরে যদি তাহাদের ভালবাসা না থাকিত তবে তাহারা এ দীর্ঘপথ চলিতে পারিত না। পথ ভালবাসে বলিয়াই প্রতি পদক্ষেপেই তাহাদের তৃপ্তি। এই, পথ ভালবাসে বলিয়াই তাহারা চলে, আবার এই, পথ ভালবাসে বলিয়াই তাহারা চলিতে চাহে না। তাহারা পা উঠাইতে চাহে না। প্রতিপদে তাহাদের ভ্রম হয় "যেমন পাইয়াছি এমন আর পাইব না"—কিন্তু অগ্রসর হইয়াই আবার সমস্ত ভুলিয়া যায়। প্রতিপদে তাহারা শোক মুছিয়া মুছিয়া চলে। তাহারা আগে ভাগে আশঙ্কা করিয়া বসে বলিয়াই কাঁদে, নহিলে কাঁদিবার কোন কারণ নাই।

ঐ দেখ, কচি ছেলেটিকে বুকে করিয়া মা সংসারের পথে চলিয়াছে। ঐ ছেলেটির উপরে মাকে কে বাঁধিয়াছে! ঐ ছেলেটিকে দিয়া মাকে কে টানিয়া লইয়া যাই-তেছে! প্রেমের প্রভাবে পথের কাঁটা মায়ের পায়ের তলে কেমন ফুল হইয়া উঠি-তেছে! ছেলেটিকে মায়ের কোলে দিয়া পথকে গৃহের মত মধুর করিয়াছে কে?—কিন্তু হায়, মা ভুল বোঝে কেন? মা কেন মনে করে এই ছেলেটির মধ্যেই তাহার অন-স্তের অবসান? কেন সে জানে না যে এ শিশুটি কেবল তাহাকে অনন্তের পথে কিছু দূর অগ্রসর করিয়া দিতে আসিয়াছে। তার পরে নিজের যাত্রায় নিজের পথে যাইবে। ছেলেই জানে ছেলেরা কোথায় থাকে; অনন্তের পথে যেখানে পৃথিবীর সকল ছেলে মিলিয়া খেলা করে, একটি ছেলে মায়ের হাতে ধরিয়া মাকে সেই ছেলের রাজ্যে লইয়া যায়—সেখানে শত কোটি সন্তান। দেখ দেখ, কি শোভা! সেখানে বিশ্বের কচি মুখ গুলি ফুটিয়া একেবারে নন্দন বন করিয়া রাখিয়াছে। কি হাসি, কি হিল্লোল! আকাশের চাঁদকে কাড়াকাড়ি করিয়া লইবার জন্য কি আগ্রহ! ছোট ছোট প্রাণ-গুলির ছায়াময় ভাব প্রকাশ করিবার জন্য আধ' আধ' জড়িত স্খলিত ভাষার কি কল্লোলই উঠিয়াছে! আবার ওদিকে শুন—সুকুমার অসহায়েরা কি কান্নাই কাঁদিতেছে! মাতৃহারা শিশুগুলি চারিদিকে চাহিয়া মা মা করিয়া কাহাকে ডাকিতেছে! দুই কচি হাত বাড়াইয়া তাহারা কোথাও কোল খুঁজিয়া পাইতেছে না। দেখ, শিশু দেহে রোগ প্রবেশ করিয়া ফুলের পাপ্‌ড়ির মত কোমল তনুগুলি জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। কোমল কণ্ঠ হইতে স্বর বাহির হইতেছে না; ক্ষীণস্বরে কাঁদিতে চেষ্টা করিতেছে, কান্না কণ্ঠের মধ্যেই মিলাইয়া যাইতেছে। মা, এইখানে আসিয়া একবার দাঁড়াও। কত হাসিমুখ

তোমার চারিদিকে ঝাঁপাইয়া পড়িবে! কত কোলহারা ছেলে তোমার কোলে উঠিবার জন্য আঁকুবাকু করিতে থাকিবে! ছোট ছোট তৃষিতদের জন্য তোমার কোমল হৃদয়ের অজস্র মাতৃস্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে। সে আনন্দের উৎস কোনকালে নিঃশেষিত হইবে না। একবার যে মা এই সন্তান রাজ্যে প্রবেশ করে সে যদি কোন দিন "ছেলে নাই" বলিয়া শোক করে তবে আকাশ হইতে দৈববাণী শুনা যায় "ছেলের অভাব নাই; মা কোথায়"?

এইরূপে একছেলে আসিয়া মাকে পৃথিবীর সকল ছেলের মা করিয়া দেয়। যার ছেলে নাই, তার কাছে অনন্ত স্বর্গের একটা দ্বার রুদ্ধ, ছেলেটি আসিয়া স্বর্গের সেই দ্বারটি খুলিয়া দেয়; তার পরে তুমি চলিয়া যাও, সেও চলিয়া যাক্। তার কাজ ফুরাইল, তার অন্য কাজ আছে।

প্রেম আমাদিগকে ভিতর হইতে বাহিরে লইয়া যায়, আপন হইতে অন্যের দিকে লইয়া যায়, এক হইতে আরেকের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। এই জন্যই তাহাকে পথের আলো বলি—সে যদি আলেয়ার আলো হইত তবে সে পথ ভুলাইয়া ঘাড় ভাঙ্গিয়া তোমাকে যা-হোক্ এক্টা-কিছুর মধ্যে ফেলিয়া দিত, আর সমস্ত রুদ্ধ করিয়া দিত, সেই এক্টা-কিছুর মধ্যে পড়িয়াই তোমার অনন্ত যাত্রার অবসান হইত—অন্য পথিকেরা তোমাকে মৃত বলিয়া চলিয়া যাইত। কিন্তু এখন সেটি হইবার যো নাই। একটিকে ভাল বাসিলেই আরেকটিকে ভাল বাসিতে শিখিবে—অর্থাৎ এককে অতিক্রম করিবার উদ্দেশেই একের দিকে ধাবমান হইতে হইবে।

পথ দেখাইবার জন্যই সকলে আসিয়াছে, পথের বাধা হইবার জন্য কেহ আসে নাই। এই জন্য কেহই ভিড় করিয়া তোমাকে ঘিরিয়া থাকে না, সকলেই সরিয়া গিয়া তোমাকে পথ করিয়া দেয়, সকলেই একে একে চলিয়া যায়। কেহই আপনাকে বা আর কাহাকেও বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। ইচ্ছা করিয়া যে ব্যক্তি নিজের চারিদিকে দেয়াল গাঁথিয়া তোলে, কালের প্রবাহ ক্রমাগতঃ আঘাত করিয়া তাহার সে দেয়াল একদিন ভাঙ্গিয়া দেয়, তাহাকে পথের মধ্যে বাহির করিয়া দেয়। তখন সে আবরণের অভাবে হি হি করিয়া কাঁপিতে থাকে, হায় হায় করিয়া কাঁদিয়া মরে। জগৎকে দ্বিধা হইতে বলে। ধূলির মধ্যে আচ্ছন্ন হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে।

আমরা ত পথিক হইয়াই জন্মিয়াছি, অনন্ত শক্তিমান্ যদি এই অনন্ত পথের উপর দিয়া আমাদিগকে কেবলমাত্র বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেন, প্রচণ্ড অদৃষ্ট যদি আমাদের চুলের মুঠি ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া যাইত তবে আমরা দুর্ব্বলেরা কি করিতে পারিতাম! কিন্তু পাষাণ অদৃষ্টের পরিবর্ত্তে প্রেম আমাদিগকে বাঁশি বাজাইয়া ডাকিয়া লইয়া যাইতেছে; মরুভূমি না হইয়া আমাদের পথের উপরে ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে। যাত্রার আরম্ভে শাসনের বজ্রধ্বনি শুনিতেছি না, প্রভাতের আশ্বাসবাণী

শুনিতেছি। পথের মধ্যে কষ্ট আছে দুঃখ আছে বটে, কিন্তু তবু আমরা ভালবাসিয়া চলিতেছি। সকল সময়ে আমরা গ্রাহ্য করি না বটে, কিন্তু ভালবাসা সহস্র দিক্ হইতে তাহার বাহু বাড়াইয়া আছে। সেই অবিশ্রাম ভালবাসার আহ্বানই আমরা যেন শিরোধার্য্য করিয়া চলিতে শিখি—মোহে জড়াইয়া না পড়ি—অবশেষে অমোঘ শাসন আসিয়া আমাদিগকে যেন শৃঙ্খলে বাঁধিয়া না লইয়া যায়।

আমি এই সহস্র লোকের বিলাপ ও আনন্দধ্বনির ধারে বসিয়া আছি। আমি দেখিতেছি, ভাবিতেছি, ভাল বাসিতেছি। আমি পথিকদিগকে বলিতেছি, তোমাদের যাত্রা শুভ হউক। আমি আমার প্রেম তাহাদিগকে পাথেয় স্বরূপে দিতেছি। কারণ, পথ চলিতে আর কিছুর আবশ্যক নাই, কেবল প্রেমের আবশ্যক। সকলে যেন সকলকে সেই প্রেম দেয়। পথিক যেন পথিককে পথ চলিতে সাহায্য করে।

---

# রাজা সীতারাম রায়।

আজ প্রায় এক শতাব্দী অতীত হইল, যশোহর জেলার মধুমতী নদী তীরে মহম্মদপুর নগরে একজন বীর পুরুষ বাস করিতেন। যে সময়ে এই প্রতিভা সম্পন্ন বীর এ অঞ্চলে রাজ্য করিতেন, তৎকালে দিল্লীনগরীতে মোগল বংশে মহম্মদ সাহ ভারত সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। এবং তাঁহার অধীনে বঙ্গের রাজধানী মুরসিদাবাদে আলিবর্দ্দি খাঁ উপবিষ্ট থাকিয়া বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা শাসন করিতেন। এই সময়ে দক্ষিণাপথবাসী মার্হাট্টারা বর্গীনামে এদেশে বিখ্যাত ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ পারস্যবীর নাদির সাহের ভারত আক্রমণের পর হইতেই সীতারাম রায়ের অভ্যুদয়ের সূত্রপাত হয়। এক্ষণে সীতারামের নাম আমাদের অনেক পাঠকের কাছে হয় ত অজ্ঞাত নয়। প্রচারের পৃষ্ঠায় বঙ্কিম বাবুর লেখনী এই সীতারামের নাম প্রচার করিতেছে। সুতরাং ইঁহার ইতিবৃত্ত শুনিতে পাঠকদের কৌতূহল জন্মিতে পারে।

সীতারাম রায় উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ। অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় ইঁহার পিতা বীরভূম জেলায় বাস করিতেন। তিনি বাণিজ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। অতি বাল্যকাল হইতে সীতারাম অনেক সময় পিতার সঙ্গে দিল্লীতে বাস করিতেন। জিনিসবিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটের নিকট অনেক অংশে পরিচিত ছিলেন। সীতারাম যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষ, সাহসী, চতুর ও কষ্টসহ পুরুষ ছিলেন। সামর্থ্যে দিল্লীতে অনেকের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। ক্রমে বাণিজ্য ব্যবসা ত্যাগ করিয়া মোগলকুলতিলক আকবরের প্রচলিত নিয়মানুসারে পঞ্চশত মোগল সেনাপতির পদে ব্রতী হইলেন। অধীন যোদ্ধৃদল তাঁহার গুণে নিতান্ত বাধ্য ছিল। এক দিন তাহারা সীতারামকে

কহিল, "চলুন আমরা আপনাকে রাজা করিব" এই আশায় আশ্বাসিত হইয়া, সীতারাম পঞ্চশত মোগল সেনা সঙ্গে করিয়া পূর্ব্ব বঙ্গদিক অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আসিবার কালীন দস্যু বৃত্তির দ্বারা অনেক ধন সঞ্চয় করেন। এইরূপে আসিতে আসিতে এক দিন যশোহরের পূর্ব্বভাগস্থ মধুমতী তীরে কোন এক জঙ্গলের নিকট উপস্থিত হইলেন,—দেখিলেন তথায় একজন ফকীর পথ আগুলিয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে। সীতারাম তাহাকে সরিয়া যাইতে কহিলে, ফকীর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে তিরষ্কার করে। এই সূত্রে ফকীরের চেলাদিগের সঙ্গে সীতারামের একটী সামান্য যুদ্ধ হয়, যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বশ্যতা স্বীকার ও প্রভুর ন্যায় ফকীরকে মান্য করিতে লাগিলেন। ফকীরও নূতন শিষ্যের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ভূষণা পরগণার বিচারক খোদা কাজির নিকট হইতে একটী সামান্য স্থান সীতারামকে নিষ্করে ভোগ করিতে চাহিয়া দিলেন। প্রভুভক্ত বীর প্রভুর গৌরব রক্ষার্থে ফকিরের নামানুসারে মহম্মদপুর ঐস্থানের নাম রাখিলেন। এই স্থানই সীতারামের উন্নতির প্রধান স্থান।

ভাগ্য পরিবর্ত্তনশীল। রথচক্রের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে সীতারামের ভাগ্য আর এক দিকে পরিবর্ত্তিত হইল। ক্রমে ক্রমে সীতারাম সমগ্র ভূষণা পরগণা অধিকার করিয়া আপনাপনি রাজ উপাধি ধারণ করিলেন। এই জন্যে সীতারামকে লোকে "ভূঁই ফোঁড়" রাজা কহিয়া থাকে। ভূষণা অধিকৃত হইলে, সীতারামের উচ্চাভিলাষ আরও বাড়িতে লাগিল। তখন তিনি বর্ত্তমান সূর্য্যকুণ্ড নামক স্থানে, রাজবাটী নির্ম্মাণ করিয়া রাজ্য বিস্তারের জন্য বহির্গত হইলেন। সীতারামের অধিকৃত ভূষণা যশোহরের বারাসিয়া নদীর অতি সন্নিকট, কিন্তু কেহ কেহ অনুমান করেন, খুলনা জেলার পসর নদী তীরে ভূষনি নামে এক বিস্তৃত স্থান আছে, অধুনা উহা জঙ্গলপূর্ণ, এখানে রাজবাটীর অনেক চিহ্ন পাওয়া যায়, এই স্থানই সীতারামের অধিকৃত ভূষণা। কিন্তু আমাদের অনুমান বারাসিয়া নদীর তীরস্থ ভূষণাই সীতারামের প্রকৃত ভূষণা, কেননা পসর নদী পর্য্যন্ত সীতারামের রাজ্য বিস্তার হইয়াছিল কি না সন্দেহ। তবে রাজবাটীর চিহ্নগুলি প্রতাপাদিত্যের সাময়িক হইতে পারে। এদিকে রাজ্য-বিস্তার-লালসা সীতারামের বৃদ্ধি পাইয়া, যশোহরের পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল। শুনা যায় বর্ত্তমান যশোহরের এক ক্রোশ পূর্ব্ব নীলগঞ্জ নামক স্থান পর্য্যন্ত সীতারাম উপস্থিত হইলে, আধুনিক চাঁচড়া রাজবংশের একজন নাকি বলিয়া ছিলেন, 'অগ্রে জাতীয় একতার মস্তকে পদাঘাত করিবেন না" এই কথায় স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রিয় বীর, পশ্চিম দিক পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিকে ধাবিত হইলেন, এবং মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ধ্বংসাবশেষ রাজ্যের প্রায় চতুর্থাংশ হস্তগত করিয়া উত্তর দিকে গতি ফিরাইলেন। এ দিকে যে তাঁহার রাজ্যের কতদূর বিস্তৃতি ছিল, জানা যায় না। তবে মাগুরা মহকুমার শত্রুদনপুর বলিয়া একটী গ্রাম আছে। এই গ্রামের বাগ্‌চি মহাশয়দিগের গৃহে ব্রহ্ম-

শুনিতেছি। পথের মধ্যে কষ্ট আছে দুঃখ আছে বটে, কিন্তু তবু আমরা ভালবাসিয়া চলিতেছি। সকল সময়ে আমরা গ্রাহ্য করি না বটে, কিন্তু ভালবাসা সহস্র দিক্ হইতে তাহার বাহু বাড়াইয়া আছে। সেই অবিশ্রাম ভালবাসার আহ্বানই আমরা যেন শিরোধার্য্য করিয়া চলিতে শিখি—মোহে জড়াইয়া না পড়ি—অবশেষে অমোঘ শাসন আসিয়া আমাদিগকে যেন শৃঙ্খলে বাঁধিয়া না লইয়া যায়।

আমি এই সহস্র লোকের বিলাপ ও আনন্দধ্বনির ধারে বসিয়া আছি। আমি দেখিতেছি, ভাবিতেছি, ভাল বাসিতেছি। আমি পথিকদিগকে বলিতেছি, তোমাদের যাত্রা শুভ হউক। আমি আমার প্রেম তাহাদিগকে পাথেয় স্বরূপে দিতেছি। কারণ, পথ চলিতে আর কিছুর আবশ্যক নাই, কেবল প্রেমের আবশ্যক। সকলে যেন সকলকে সেই প্রেম দেয়। পথিক যেন পথিককে পথ চলিতে সাহায্য করে।

---

# রাজা সীতারাম রায়।

আজ প্রায় এক শতাব্দী অতীত হইল, যশোহর জেলার মধুমতী নদী তীরে মহম্মদপুর নগরে একজন বীর পুরুষ বাস করিতেন। যে সময়ে এই প্রতিভা সম্পন্ন বীর এ অঞ্চলে রাজ্য করিতেন, তৎকালে দিল্লীনগরীতে মোগল বংশে মহম্মদ সাহ ভারত সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। এবং তাঁহার অধীনে বঙ্গের রাজধানী মুরসিদাবাদে আলিবর্দ্দি খাঁ উপবিষ্ট থাকিয়া বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা শাসন করিতেন। এই সময়ে দক্ষিণাপথবাসী মার্হাট্টারা বর্গীনামে এদেশে বিখ্যাত ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ পারস্যবীর নাদির সাহের ভারত আক্রমণের পর হইতেই সীতারাম রায়ের অভ্যুদয়ের সূত্রপাত হয়। এক্ষণে সীতারামের নাম আমাদের অনেক পাঠকের কাছে হয় ত অজ্ঞাত নয়। প্রচারের পৃষ্ঠায় বঙ্কিম বাবুর লেখনী এই সীতারামের নাম প্রচার করিতেছে। সুতরাং ইঁহার ইতিবৃত্ত শুনিতে পাঠকদের কৌতূহল জন্মিতে পারে।

সীতারাম রায় উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ। অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় ইঁহার পিতা বীরভূম জেলায় বাস করিতেন। তিনি বাণিজ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। অতি বাল্যকাল হইতে সীতারাম অনেক সময় পিতার সঙ্গে দিল্লীতে বাস করিতেন। জিনিসবিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটের নিকট অনেক অংশে পরিচিত ছিলেন। সীতারাম যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষ, সাহসী, চতুর ও কষ্টসহ পুরুষ ছিলেন। সামর্থ্যে দিল্লীতে অনেকের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। ক্রমে বাণিজ্য ব্যবসা ত্যাগ করিয়া মোগলকুলতিলক আকবরের প্রচলিত নিয়মানুসারে পঞ্চশত মোগল সেনাপতির পদে ব্রতী হইলেন। অধীন যোদ্ধৃদল তাঁহার গুণে নিতান্ত বাধ্য ছিল। এক দিন তাহারা সীতারামকে

কহিল, "চলুন আমরা আপনাকে রাজা করিব" এই আশায় আশ্বাসিত হইয়া, সীতারাম পঞ্চশত মোগল সেনা সঙ্গে করিয়া পূর্ব্ব বঙ্গদিক অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আসিবার কালীন দস্যু বৃত্তির দ্বারা অনেক ধন সঞ্চয় করেন। এইরূপে আসিতে আসিতে এক দিন যশোহরের পূর্ব্বভাগস্থ মধুমতী তীরে কোন এক জঙ্গলের নিকট উপস্থিত হইলেন,—দেখিলেন তথায় একজন ফকীর পথ আগুলিয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে। সীতারাম তাহাকে সরিয়া যাইতে কহিলে, ফকীর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে তিরস্কার করে। এই সূত্রে ফকীরের চেলাদিগের সঙ্গে সীতারামের একটী সামান্য যুদ্ধ হয়, যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বশ্যতা স্বীকার ও প্রভুর ন্যায় ফকীরকে মান্য করিতে লাগিলেন। ফকীরও নূতন শিষ্যের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ভূষণা পরগণার বিচারক খোদা কাজির নিকট হইতে একটী সামান্য স্থান সীতারামকে নিষ্করে ভোগ করিতে চাহিয়া দিলেন। প্রভুভক্ত বীর প্রভুর গৌরব রক্ষার্থে ফকিরের নামানুসারে মহম্মদপুর ঐস্থানের নাম রাখিলেন। এই স্থানই সীতারামের উন্নতির প্রধান স্থান।

ভাগ্য পরিবর্ত্তনশীল। রথচক্রের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে সীতারামের ভাগ্য আর এক দিকে পরিবর্ত্তিত হইল। ক্রমে ক্রমে সীতারাম সমগ্র ভূষণা পরগণা অধিকার করিয়া আপনাপনি রাজ উপাধি ধারণ করিলেন। এই জন্যে সীতারামকে লোকে "ভূঁই ফোঁড়" রাজা কহিয়া থাকে। ভূষণা অধিকৃত হইলে, সীতারামের উচ্চাভিলাষ আরও বাড়িতে লাগিল। তখন তিনি বর্ত্তমান সূর্য্যকুণ্ড নামক স্থানে, রাজবাটী নির্ম্মাণ করিয়া রাজ্য বিস্তারের জন্য বহির্গত হইলেন। সীতারামের অধিকৃত ভূষণা যশোহরের বারাসিয়া নদীর অতি সন্নিকট, কিন্তু কেহ কেহ অনুমান করেন, খুলনা জেলার পসর নদী তীরে ভূধনি নামে এক বিস্তৃত স্থান আছে, অধুনা উহা জঙ্গলপূর্ণ, এখানে রাজবাটীর অনেক চিহ্ন পাওয়া যায়, এই স্থানই সীতারামের অধিকৃত ভূষণা। কিন্তু আমাদের অনুমান বারাসিয়া নদীর তীরস্থ ভূষণাই সীতারামের প্রকৃত ভূষণা, কেননা পসর নদী পর্য্যন্ত সীতারামের রাজ্য বিস্তার হইয়াছিল কি না সন্দেহ। তবে রাজবাটীর চিহ্নগুলি প্রতাপাদিত্যের সাময়িক হইতে পারে। এদিকে রাজ্য-বিস্তার-লালসা সীতারামের বৃদ্ধি পাইয়া, যশোহরের পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল। শুনা যায় বর্ত্তমান যশোহরের এক ক্রোশ পূর্ব্ব নীলগঞ্জ নামক স্থান পর্য্যন্ত সীতারাম উপস্থিত হইলে, আধুনিক চাঁচড়া রাজবংশের একজন নাকি বলিয়া ছিলেন, 'অগ্রে জাতীয় একতার মস্তকে পদাঘাত করিবেন না" এই কথায় স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রিয় বীর, পশ্চিম দিক পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিকে ধাবিত হইলেন, এবং মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ধ্বংসাবশেষ রাজ্যের প্রায় চতুর্থাংশ হস্তগত করিয়া উত্তর দিকে গতি ফিরাইলেন। এ দিকে যে তাঁহার রাজ্যের কতদূর বিস্তৃতি ছিল, জানা যায় না। তবে মাগুরা মহকুমার শব্দলপুর বলিয়া একটী গ্রাম আছে। এই গ্রামের বাগ্‌চি মহাশয়দিগের গৃহে ব্রহ্ম-

ত্রর নিদর্শন স্বরূপ সীতারামের প্রদত্ত একখানি তাম্রফলক অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এবং পাংশার নিকট সীতারামের গতিবিধির চিহ্ন আছে, ইহাতেই বোধ হয় সীতারামের রাজত্ব গড়াই নদীর অপর পার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্ব্ব দিকে তাঁহার রাজ্যের বিস্তৃতি অনেকাংশে কম ছিল, কেননা বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপের রাজাদিগের উত্তরাধিকারীগণ নিতান্ত হীনপ্রভ ছিলেন না।

এইরূপে রাজ্য সীমাবদ্ধ করিয়া রাজা সীতারাম নিরুদ্বেগে জীবনের মধ্য ভাগ ভোগসুখে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে লোকে কথায় কথায় বলিয়া থাকে "সীতারামী সুখ" ইহার তাৎপর্য্য আর কিছুই নহে অর্থাৎ রাজা প্রত্যহ নূতন সরসী খনন করিয়া স্নান করিতেন তিন শত কোরা তাঁহার সৈন্যদিগের সঙ্গী ছিল। সুন্দরী পরিচারিকাদিগের দ্বারা রাজা তৈল মর্দ্দন করাইতেন, এইরূপ অনেক বিলাসিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। অদ্যাপিও মাহামুদপুর নগরে সীতারামের খনিত অপূর্ব্ব দুইটি জলাশয় "সুখসাগর ও রামসাগর" নামে অভিহিত আছে। মাগুরার নিকট মঘী গ্রামে 'সীতারামী পুকুর' নামে একটী পুকুর অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। রাজা এরূপ বিলাসিতার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন।

এদিকে কতিপয় দুষ্টবুদ্ধি লোক সীতারামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়া, মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে জানাইল যে, বিনা করে সীতারাম এ অঞ্চল ভোগ দখল করিতেছে। এই কথায় নবাব আলিবর্দ্দি কহিয়াছিলেন যে,"সে কি,ওপ্রদেশে কি আবার লোকালয় আছে! আমিতো জানি ও প্রদেশ জঙ্গলময়, ভাল পঞ্চশত সেনা সীতারামকে গ্রেপ্তার করিয়া আনুক।" এই কথায় পাঁচশত সৈন্য সীতারামকে ধরিতে গঁদখালি পর্য্যন্ত আসিতে না আসিতেই একটী পুষ্করিণীর মধ্যে সৈন্যদিগের মস্তক নিহিত হইল। তদবধি উক্তস্থানে "ডাকাইতের পুকুর" বলিয়া একটী পুষ্করিণী বর্ত্তমান আছে। নবাব আলিবর্দ্দি এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সামন্ত রাজাদিগের প্রতি সীতারামের গ্রেপ্তারী পরয়ানা দিলেন। তৎকালে চাঁচড়া, নাটোর, বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি কয়েকটী মুরশিদাবাদের সামন্ত রাজ্য ছিল। প্রথমতঃ কৃষ্ণনগরাধিপকে পরোয়ানা দেওয়া হয়। মহারাজ অসম্মত হইলে, নাটোরের রাজা, প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর স্বামী রামকান্তের প্রতি পরোয়ানা অর্পিত হইল। তখন রামকান্ত নিতান্ত বালক, এই কারণে তাঁহার দেওয়ান ও অভিভাবক বর্ত্তমান দিঘাপতীয়া রাজবংশের আদি পুরুষ মহাত্মা দয়ারাম রায়, রামকান্তের নামে সীতারামের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা লইয়া যশোহরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাৎকালিক বঙ্গে দয়ারামের তুল্য বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান লোক আর দ্বিতীয় ছিল না। এই মহাপুরুষ এক দিন রামকান্তকে রাজ্য দিয়াছেন ও এক দিন রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছেন। দয়ারাম সৈন্য সঙ্গে বর্ত্তমান দিঘাপতীয়ার যশোহর জমীদারী কাছারী বুনাগাতীতে উপস্থিত হইয়া, কোন এক ব্রাহ্মণের আতিথ্য স্বীকার করেন, এবং কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ "যদুখালির

খাল” নামে একটী খাল খনন করিয়া, ব্রাহ্মণের অনেক পতিত জমী উর্ব্বরা করিয়া দিয়া যান। দয়ারাম এই স্থানে থাকিতে থাকিতে মামুদপুরে সীতারাম, শত্রু আসিয়াছে সংবাদ পাইলেন। ঐ সময়ে সীতারামের স্থাপিত কৃষ্ণচন্দ্র বিগ্রহের মহা উৎসবে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইতেছিল। রাজা সীতারাম সহসা দেখিলেন, কৃষ্ণচন্দ্র বিগ্রহের পাদ-দেশে তাঁহার নামের পরিবর্ত্তে দয়ারামের নাম খোদিত হইয়া গিয়াছে। তখন ধর্ম্মান্ধ রাজা, কাহারও কাহারও মতে, যুদ্ধে কোন ফল হইবে না জানিয়া, দয়ারামের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন এই কথা শুনা যায়। কিন্তু একজন প্রতিভাশালী বীর, যে বিনা যুদ্ধে স্বাধীনতা-সুখ ত্যাগ করিয়াছিলেন বিশ্বাস হয় না। আরও একটী প্রবাদ আছে যে, দয়ারাম যখন কোন ক্রমেই সীতারামকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না, তখন কূট মন্ত্রণায় স্থির হইল, কৌশলে সীতারামকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে। এই অনুসারে এক দিন রাত্রে দয়ারাম শিবিরে যাত্রা গান দিয়াছিলেন, সেই সময় সীতারামের সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি নিশ্চিন্ত ভাবে গান শুনিতে ছিল। তখন চান্দোয়ার দড়ি কাটিয়া দয়ারাম “মেনা হাতীকে” গ্রেপ্তার করিলেন। সীতারামের দক্ষিণ হস্ত বদ্ধ করিলেন। আবার এরূপও শুনা যায় যে, কৃষ্ণচন্দ্র বিগ্রহের বৈকালিক উপাসনা কালীন প্রণাম করিবার সময় মেনাহাতীকে গ্রেপ্তার করা হয়। যাহা হউক এই বীরকে আবদ্ধ করায় সীতারাম দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। “মেনা হাতী ও রামাবাধা” নামে সীতারামের দুই জন বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন। এই রূপ প্রবাদ আছে যে মেনাহাতীর পূর্ব্বের নাম রামরূপ ঘোষ। কেহ কেহ ইহাঁকে ক্ষত্রিয় কহিয়া থাকেন। শুনিয়াছি যশোহরের রায় গ্রামের ঘোষ মহাশয়েরা ইহাঁরই বংশ-সম্ভূত। এই বংশে ডাক্তার সীতানাথ ঘোষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মেনাহাতীর যুদ্ধবিদ্যার এত দূর পরিচয় পাওয়া যায় যে সামর্থ্যে দুইটা মত্ত করীও তাহার সমকক্ষ ছিল না। এই বীরের হস্ত-নিক্ষিপ্ত শর, যত দূর গিয়াছিল “সুখসাগর ও রামসাগর” নামক জলাশয় তত দূর পর্য্যন্ত খনন করা হয়। মেনাহাতী বদ্ধ হইলে, দিবসত্রয় ক্রমাগত যুদ্ধ চলিয়াছিল। সমর-কার্য্য-পটু তরবারী অনিবার্য্য বেগে চলিতে চলিতে নর-শোণিতে মধুমতী নদী রঞ্জিত করিয়া ফেলিল। চতুর্থ দিবসে সীতারামও পরাস্ত হইয়া বন্দীকৃত হইলেন, বঙ্গসূর্য্য হীনপ্রভ হইল, যবনের পতাকা মধুমতী তীরে আবার উড়িল, পঞ্চম দিবসে মামুদপুর নগর লুট আরম্ভ হইল। এই লুটের দ্রব্য সমস্তই রাজসাহী গিয়াছিল। দশ বার মন মিষ্টান্ন ধরিতে পারে এমন একখানি পিত্তলময় পরাত (থালা) এখনও দিঘাপতীয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়।

বন্দীকৃত মহাবীর সীতারামের জীবন-বায়ু যে কোথায় নিঃশেষ হইয়াছিল তাহার কোন স্থিরতা নাই। তবে কাহারও কাহারও মতে, অপমানিত ঘৃণিত ও অকর্ম্মণ্য জীবনের আবশ্যক নাই বলিয়া রাজা সীতারাম হীরকাঙ্গুরী চোষণ করত জীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে মুর্শিদাবাদ যাইতে নাটোরেই সীতারামের

জীবন নিঃশেষ হয়। মহাত্মা দয়ারাম, সীতারামকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার অধিকৃত ভূষণা ও নলদি পরগণা, রামকান্তের নামে মুর্শিদাবাদের নবাব দরবার হইতে, জমীদারী-সত্বে নাম পত্তন করিয়া লইলেন। ক্রমে রাজা রামকান্ত বিলাসী হইয়া উঠিলে, তাঁহার রাজ্যবিচ্যুতির সময় নলদির অন্তর্গত তরপ মাউল কাল্না দয়ারাম মুর্শিদাবাদ হইতে নিজের নামে কায়েমী মৌরসী করিয়া লইলেন। এই সূত্রেই যশোহর জেলায় দিঘা-পতীয়ার জমীদারী সৃষ্টি হইল। এ দিকে একজন স্বদেশ-প্রেমিক, স্বজাতি-বৎসল, স্বাধীনচেতা, রাজার কীর্ত্তি মাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া জীবন অবশেষ হইল। রাজা সীতা-রামকে, অনেকে দস্যু ও বিলাসী বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা যত দূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে স্থির বলিতেছি যে সীতারামের ন্যায় ধার্ম্মিক, স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রিয়, স্বাধীনচেতা বীর, এক প্রতাপ আদিত্য ভিন্ন বঙ্গ দেশে অতি অল্পই ছিল। যৎকালে সীতারামের অভ্যুদয় হয়, তখন "জোর যার, মুলুকতার" "যার লাঠী, তার মাটী" এই কথা বঙ্গের আবাল বৃদ্ধ সকলেরই হৃদ্গত ছিল। সীতারামও এই প্রথার অনুযায়ী চলিয়াছিলেন। রাজ্যবিস্তার লাঠীর উপরই নির্ভর করে, তাই বলিয়া তাঁহাকে দস্যু বলিতে পারা যায় না। তবে রাজা অনেকাংশে বিলাসী ছিলেন বটে। বীর সীতারাম যেরূপ বিলাসী ছিলেন তাহা অপেক্ষা ধর্ম্মকার্য্যে ইহাঁর বেশী প্রবৃত্তি ছিল। অদ্যাপি এ অঞ্চলে তাহার সুস্পষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। দেবালয়, জলাশয়, পান্থ-নিবাস, প্রভৃতি সৎকার্য্যের নিমিত্ত অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্থাপিত "দশভুজা," "লক্ষ্মী নারায়ণ," "কৃষ্ণচন্দ্র" প্রভৃতি বিগ্রহ মামুদপুরে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। মন্দিরত্রয়ে তিনটী শ্লোক পাইয়াছি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম *। একটি ১৬২৬ শকে আরটি ১৬২৭ শকে অপরটি ১৬২৪ শকে নির্ম্মিত।

১। লক্ষ্মী নারায়ণঃ স্থিত্যৈঃ তর্কাঙ্কিরসভূষকে নির্ম্মিতং।
পিতৃপুণ্যার্থে সীতারাম রায়েন মন্দিরং।

২ মহীভুজঃ রসঃক্ষৌণি শাকে দশভুজালয়ং
অকারি শ্রীমতা সীতারাম রায়েন মন্দিরং।

৩। বানঃ দ্বন্দ্বাঙ্গ চন্দ্রে, পরিগণিত শকে কৃষ্ণতোষাভিলাষং
শ্রীমদ্বিশ্বাস খাশোদ্ভব কুল কমলে,
ভাষক ভানুতুল্য স্নানৌঘ যুক্তং রুচির রুচি হরে,
কৃষ্ণ গৃহং বিচিত্রং, যদুপতি নগরে ভক্তি মস্তং সনজ্জং।

মন্দিরে যেরূপ লিখিত ছিল অবিকল সেইরূপ লিখিলাম। এই শ্লোক ত্রয়ের মধ্য হইতে, মাহামুদপুরের আর একটী নাম পাওয়া গিয়াছে যথা—"যদুপতি নগর" এবং রাজার রাজত্ব কাল নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ইহাতেই অনুমান হয়, রাজা সীতারাম রায় ১৬২৬ শকে এ অঞ্চলে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। এই মহামুদপুরে আরও কতিপয়

দেবালয় আছে। শুনা যায় সিরাজউদ্দৌল্লার ভয়ে ভীতা প্রাতঃস্মরণীয়া দ্বিতীয় অন্নপূর্ণা রাণী ভবানীর কন্যা "তারা দেবী" এই নগরে বাসকালীন "রামচন্দ্র" প্রভৃতি বিগ্রহগুলি স্থাপিত করেন। এক কালে মামুদপুর সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। আজ সে স্থান ব্যাঘ্র ও বরাহের আবাসভূমি হইয়াছে। এই বংশীয় মহা পুরুষেরা অতি হীন অবস্থায় মামুদপুরের অপর পারে হরিহর নগর নামক গ্রামে এক্ষণে কালাতিপাত করিতেছেন। কালের অনিবার্য্য গতি। মধুমতী নদী মামুদপুরকে গ্রাস করিতেছে কিন্তু রাজার কীর্ত্তি চিরকালই সমান থাকিবে।

শ্রীমোঃ
মাওয়া

---

# শিউলিফুলের গাছ।

আমি সমস্ত দিন কেবল টুপ্‌টাপ্ করিয়া ফুল ফেলিতেছি; আমার ত আর কোন কাজ নাই। আমার প্রাণ যখন পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, আমার শাদা শাদা হাসিগুলি মধুর অশ্রু জলের মত আমি বর্ষণ করিতে থাকি।

আমার চারিদিকে কি শোভা! কি আলো! আমার শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় সূর্য্যের কিরণ নাচিতেছে। বীণার তারের উপর মধুর সঙ্গীত যেমন আপনার আনন্দে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠে, স্বর্গ হইতে নামিয়া আসে, এবং কাঁপিতে কাঁপিতে স্বর্গেই চলিয়া যায়; আমার পাতায় পাতায় প্রভাতের আলো তেম্‌নি করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, চমক্ খাইয়া আকাশে ঠিকরিয়া পড়িতেছে, সেই আলোকের চম্পক-অঙ্গুলি স্পর্শে আমার প্রাণের ভিতরেও ঝিন্‌ঝিন্ করিয়া বাজিয়া উঠিতেছে, কাঁদিয়া উঠিতেছে,—আমি আপনাকে আর রাখিতে পারিতেছি না—বিহ্বল হইয়া আমার ফুলগুলি ঝরিয়া পড়িতেছে।

বাতাস আসিয়াছে। ভোরের বেলায় জাগিয়া উঠিয়াই আমাকে তাহার মনে পড়িয়াছে। রাত্রে সে স্বপ্ন দেখিয়া মাঝে মাঝে জাগিয়া আমার কোলের উপর আসিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়ে। আমার কোমল পল্লবের স্তরের মধ্যে আসিয়া সে আরাম পায়। আধ'-আধ' স্বরে সে আমাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া কথা কহে, সে তাহার খেলার গল্প করে, আকাশের মেঘ ও সমুদ্রের ঢেউয়ের কাহিনী বলে—বলিতে বলিতে ভুলিয়া যায়, চলিয়া যায়—আবার কখন্ আপন মনে ফিরিয়া আসে। সে যখন দূর হইতে আসিয়া দুই একটা কথা বলিয়া আমার পাশ দিয়া চলিয়া যায়, তাহার উড়ন্ত আঁচলটি আমার গায়ে

একটু ঠেকিয়া অমনি উড়িয়া যায়, আমার সমস্ত ডাল পালা চঞ্চল হইয়া উঠে, আমার ফুলগুলি তাহার পিছন পিছন উড়িয়া যায়, স্নেহভরে ভূমিতে পড়িয়া যায়।

দুপর বেলা চারিদিক নিঝুম হইয়া গেলে একটি পাখী আসিয়া আমার পাতার মধ্যে বসিয়া এক-সুরে ডাকিতে থাকে। তাহার সেই সুর শুনিয়া ছায়াখানি আমার তলায় ঘুমাইয়া পড়ে। বাতাস আর চলিতে পারে না। মেঘের টুকরা স্বপ্নের মত ভাসিয়া যায়। দূর হইতে রাখালের বাঁশির স্বর মিলাইয়া আসে। ঘাসের ভিতরে বেগুণী ফুলগুলি বৃন্তসুদ্ধ মাথা হেঁট করিয়া থাকে। দুই একটা করিয়া আমার ফুল যেন ভুলিয়া ঝরিয়া পড়ে। তাহারাও সেই পাখীর এক সুরে এক গানের মত, সমস্ত দুপর বেলা একভাবে এক ছন্দে একটির পরে একটি করিয়া ঝরিতে থাকে—ভূমিতে পড়িয়া মরিতে থাকে—আপনার মনে মিলাইয়া যায়।

সন্ধ্যার কনক উপকূল ছাপাইয়া অন্ধকার যখন জগৎ ভাসাইয়া দেয়, আমি তখন আকাশে চাহিয়া থাকি। আমার মনে হয় আমার আজন্মকালের ঝরা ফুলগুলি আকাশে তারা হইয়া উঠিয়াছে। উহাদের মধ্যেও দুয়েকটা কখন কখন ঝরিয়া আসে, বোধ করি আমারই তলায় আসিয়া পড়ে, সকালে তাহার উপরে শিশির পড়িয়া থাকে। এইরূপ স্বপ্ন ভাবিতে ভাবিতে আমি ঘুমাইয়া পড়ি এবং ঘুমাইতে ঘুমাইতে স্বপ্ন দেখি। নিশাথের মাধুরী আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। আমি স্বপ্নে অনুভব করিতে থাকি ধীরে ধীরে আমার কুঁড়িগুলি আমার সর্ব্বাঙ্গে পুলকের মত ছাইয়া উঠিতেছে। আধ' ঘুমঘোরে শুনিতে পাই আমার সন্ধ্যাবেলাকার ফোটা' ফুলগুলি টুপ্‌টাপ্ করিয়া অন্ধকারে ঝরিয়া পড়িতেছে।

আমি সমস্ত দিনরাত্রি এই নীল আকাশের তলে দাঁড়াইয়া আছি—আমি চলিতে পারি না, খুঁজিতে পারি না, কোথায় কি আছে সকল দেখিতে পাই না। আমি কেবল আকাশের গুটিকত তারা চিনিয়া রাখিয়াছি, আর কাননের গুটিকতক গাছ দেখিতে পাই, তাহারা প্রভাতের আনন্দে আমারই মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে। আমার কাছে দূর বন হইতে ফুলের গন্ধ আসে, কিন্তু সে ফুল আমি দেখিতে পাই না। পল্লবের মর্ম্মর শুনিতে পাই কিন্তু কোথায় সে ছায়াময় বন! শুভ্র ক্ষীণ মেঘ আকাশের উপর দিয়া ভাসিয়া যায়—কিন্তু কোথায় সে যায়! যে পাখী অনেক দূর হইতে উড়িয়া আমার ডালে আসিয়া বসে সে কেন আমাকে জগতের সকল কথা বলিয়া যায় না!

আমি একজায়গায় দাঁড়াইয়া থাকি—যাহার জন্য আমার ফুল ফুটিতেছে মনের সাধ মিটাইয়া তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে পারি না। এই জন্য আমি সমস্ত দিন ফুল ফেলিয়া ফেলিয়া দিই—আমি দাঁড়াইয়া থাকি কিন্তু আমার সুগন্ধ আমার প্রাণের আশা ঘুরিয়া বেড়ায়। আমার ফুলগুলি আমি বাঁধিয়া রাখি না, তাহারা উড়িয়া যায়। তাহাদের আমি জগতে পাঠাইয়া দিই আমার আনন্দের বার্ত্তা তাহারা দূরে গিয়া প্রচার করিয়া

আসে। আমি আমার অজানা অচেনাকে ফুলের অক্ষরে চিঠি লিখিয়া পাঠাই। নিশ্চয় তাহার হাতে গিয়া পৌঁছায় নহিলে আমার মনের ভার লাঘব হয় কেন? আমি নীলাকাশে চাহিয়া উদ্দেশে আমার প্রিয়তমের চরণে অনুক্ষণ অঞ্জলিপূর্ণ ফুল ঢালিয়া দিই, আমি যেখানে যাইতে পারি না, আমার ফুলেরা সেখানে চলিয়া যায়।

ছোট মেয়েটি আমার তলা হইতে অবহেলে অমনি এক মুঠো ফুল কুড়াইয়া লয়, মাথায় দুটো ফুল গুঁজিয়া চলিয়া যায়। কোথায় কোন্ নদীর ধারে কোন্ ছোট কুটীরে তাহার ছোট ছোট সুখ দুঃখের মধ্যে আমার ফুলের গন্ধ মিশাইতে থাকে। বৃদ্ধ সকালে সাজি করিয়া আমার ফুল দেবতার চরণে অর্পণ করে, তাহার ভক্তির সহিত আমার ফুলের গন্ধ আকাশে উঠিতে থাকে।

আমি প্রতিদিন সকালে যে আনন্দপূর্ণ সূর্য্যালোক, স্নেহপূর্ণ বাতাস পাই, আমি আমার ফুলের মধ্যে করিয়া সেই আলোক সেই বাতাস ফিরাইয়া দিই। জগতের প্রেম আমার মধ্যে ফুল হইয়া ফুটিয়া জগতে ফিরিয়া যায়। আমার যত আছে তত দিই। আরো থাকিলে আরো দিতাম।*

দিয়া কি হয়? শুকাইয়া যায় ছড়াইয়া যায়—কিন্তু ফুরাইয়া যায় না, আমার কোল ত শূন্য হয় না প্রতি দিন আবার আমার প্রাণ ভরিয়া উঠে। প্রতিদিন নূতন প্রাণের উচ্ছাস হৃদয় হইতে বাহির করিয়া সূর্য্যালোকে ফুটাইয়া তুলা, এবং প্রতিদিন আনন্দধারা অজস্র ধারে জগতের মধ্যে বিসর্জন করিয়া দেওয়া এই সুখই আমি কেবল জানি; তারপরে আমার ফুল কে চায় আমার ফুল কে গ্রহণ করে, আমার ফুল কে দলন করে আমি তাহার কিছুই জানি না। মনের মধ্যে এই বিশ্বাস যে, আমার এই ফুল ফোটান' ফুল বিসর্জন অবশ্য কিছু না-কিছু কাজে লাগেই। আমার ঝরা ফুলগুলি জগৎ কুড়াইয়া লয়। অতীত আমার ঝরা ফুল লইয়া মালা গাঁথে। আমার সহস্র ফুল অবিশ্রাম ঝরিয়া ঝরিয়া সুদূর ভবিষ্যতের জন্য এক অপূর্ব্ব নূতন শতদল রচনা করে। প্রভাত সঙ্গীতের তালে তালে আমার ফুলের পতন হয়। সেই সুমধুর ছন্দ আমার ফুলের পতনে জগতের নৃত্য গাত সম্পূর্ণ হইতেছে।

আকাশের তারা গুলিও স্বর্গীয় কল্পতরুর ঝরা ফুল, তাহারা কি কোন কাজে লাগে না? মালার মত গাঁথিয়া কেহ কি তাহাদের গলায় পরে নাই? কোমল বলিয়া আমার ফুলগুলির উপরে কেহ কি পাও রাখিবে না? আমি জানি আমার ফুলগুলি ঝরিয়া জননী লক্ষ্মীর পদ্মাসনের তলে পুনর্জ্জন্ম লাভ করে। সেখানে অমৃতধারায় অনন্তকাল প্রফুল্ল হইয়া থাকে। সেই অমর সৌন্দর্য্যের স্তরের উপর স্তরে জগদ্ব্যাপী স্তরের মধ্যে একটি ছোট পাপ্ড়ি হইয়া আনন্দে বিকশিত হইতে থাকে।

———

# শ্রীচরণেষু ।

দাদা মহাশয়, নবীন ভায়া পুজোর ছুটিতে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন। তাঁহার অজীর্ণ হইয়াছে ক্ষুধা হয় না তাই পশ্চিমের হাওয়ায় ক্ষুধা সঞ্চয় করিতে গিয়াছেন; ফিরিয়া আসিয়া আপিসের সাহেবের গুঁতা খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবেন। কেরাণী বাবুর পক্ষে অজীর্ণ রোগই ভাল, কারণ মনিবের গালি ছাড়া খাবার বেশি নাই; তাই আর সমস্তই হজম করিতে হয় কেবল অন্নটা হজম হয় না। যাহা হোক্, নবীনের অনুপস্থিতিতে তোমার চিঠি আমার হাতে আসিয়া পড়ে। চিঠি পড়িয়া আমি কিছু আশ্চর্য্য হইলাম।

লিখিয়াছ "কেরানী-গিরিতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—আর ব্যবসা বাণিজ্যকে পাগলামী বলি।" এ কথাটি পূর্ণমাত্রায় স্বীকার করিতে পারি কৈ! কথাটা বাহ্যিক শুনিতে ঠিক হইলেও ভিতরে প্রবেশ সময়ে যেন কেমন্-কেমন্ বোধ হয়। প্রথমেইত মনে উদয় হয় আমরা কেরাণিগিরীতে এত মজবুত হলুম কি করে, আবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাবি—সত্য সত্যই কি আমরা কেরাণিগিরি ভালবাসি? আর যদি ভালবাসি ত তাহার কারণ কি?

এই বার এক এক করিয়া দেখা যাউক,—প্রকৃতপক্ষে ইংরাজদের আমল্ হইতেই আমরা কেরাণীর ব্রত অবলম্বন করিয়াছি। তখন সাহেবেরা ডাকিয়া চাকুরী দিত। অনেক অনুসন্ধান করিয়া এক আদটি কেরাণী সংগ্রহ হইত। অনেকে চাকুরির নাম শুনিয়া গা-ঢাকা হইত। বিশেষ প্রয়োজন ও সমূহ কষ্টে না পড়িলে কেহই দাসত্ব করিত না। সাহেবেরাও হিন্দুদিগের সহিত অতি সন্তর্পণে ব্যবহার করিত ও তাঁহাদিগকে যথেষ্ট মান্য করিত। হিন্দু কেরাণীদিগের টেবিল ও চেয়ার পর্য্যন্ত ছুঁইত না। পাল পার্ব্বণে কেরাণীগণকে পুরষ্কার দেওয়া হইত। দোল দুর্গোৎসব, পুত্র কন্যাদির বিবাহ, বা নূতন গৃহ নির্ম্মাণ সময়ে বিলক্ষণ সাহায্য করিত। পীড়াদি হইলে সাহেবেরা স্বয়ং ডাক্তার সঙ্গে করিয়া দেখিতে আসিত। আরোগ্য হইয়া আপিসে আসিলে আরো দিন কতক আরাম লইতে অনুরোধ করিত। অনটন হইয়াছে জানাইলেই তৎক্ষণাৎ সাহায্য করিত। তখন লোকে কথায় কথায় কর্ম্ম ত্যাগ করিত, আবার সাহেবেরা ডাকাইয়া আনিয়া চাকুরী দিত। ফলকথা তখন সাহেবেরা ভদ্রবংশজাত হিন্দুদিগের উপর প্রভুত্ব দেখাইত না; আপনাদের বন্ধুর ন্যায় জ্ঞান করিত, যেন এক পরিবারের লোক। এইখানেই বঙ্গবাসী কুহকে ডুবিল। ভাবিল চিরকালই এইরূপ যাইবে। ক্রমে কেরাণিগিরী সংক্রামক হইয়া পড়িল; সকলেই আপনাপন ব্যবসা ছাড়িয়া ঐ একমাত্র পথ অনুসরণ করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল এইরূপে শীঘ্রই কেরাণিগিরিতে মজ্‌বুত হওয়া গেল; ভালবাসাও জন্মিল।

আর্ আজকাল! আজকাল আর কাহাকেও চাকুরীর জন্য ডাকিতে হয় না। দু চার জন সদাই উমেদার আছে। একটি ২৫ টাকার কর্ম্ম খালি হইলে আদ্যশ্রাদ্ধের ভিড় পড়িয়া যায়। কত উপাধিধারী মহাশয়কে দ্বারস্থ হইতে দেখা যায়। প্রভুদেরও আর সেরূপ ব্যবহার নাই এখন কথায় কথায় কেরাণীগণকে নানা সুমিষ্ট ভাষায় সম্ভাষণ হইয়া থাকে। আপিসে যাইতে ৫ মিনিট দেরী হইলে আমাদের পেটের অন্ন ত চাল হইয়া যায়ই আবার তাহার উপর জরিমানা বা আরো কিছু উৎকট পীড়ন হইয়া থাকে। যেমনই গুরুতর প্রয়োজন হউক না কেন কিন্তু কামাই হইবার যো নাই। প্রতি পদে ডিফল্টার বুকে নাম উঠিতেছে।

পিতার মুখাগ্নি,——রবিবার করিও! বিশেষ অসুস্থতাবশতঃ একদিন কামাই হইলে ডাক্তারের সার্টিফিকেট চাই। তোমার পল্লিগ্রামে বাড়ি তা বলিয়া কবিরাজি চিকিৎসা করাইতে পারিবে না; সে ইংরাজি লেখাপড়া জানে না। পূর্ব্বের ন্যায় উভয়ের মধ্যে আর সে সহৃদয় ভাব নাই সে একপ্রাণতা নাই। এখন মালিক ও কেরানীতে, প্রভু ও কুক্কুর সম্বন্ধ হইয়াছে। আর সে দিন নাই—আর সে সুখ নাই।

তবে কেন আমরা কেরানিগিরীকে এত বিশ্বাস করি! কারণ আছে। পূর্ব্বে চাকুরীর আস্বাদ পাইয়া অনেকেই আপন আপন ব্যবসা ত্যাগ করত দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিল এখন তাহাদের পুত্র পৌত্রাদিগণের মার্জ্জিত শিক্ষার গুণেই হউক বা দোষেই হউক চাকুরী ত্যাগ করিয়া আপন আপন ব্যবসা অবলম্বন করিতে যেন বাধ-বাধ ঠেকিতেছে! যেই পুত্র চতুর্থ বর্ষ উত্তীর্ণ হইল অমনি পিতা ডেস্ক কাগজ কলম প্রভৃতি তৈজশ আনিয়া উপস্থিত করিলেন। পুত্র পড়ুক বা না পড়ুক কিন্তু লেখাটা দুরস্ত চাই। আগে লেখা তার পর পড়া। মধ্যে মধ্যে জননিও বলিয়া থাকেন "নবীন দু তক্তা লেখ বাবা।" পাড়া পড়শির নিকট নবীনের সুখ্যাতি ধরে না; "নবীন আমার লেখে যেন এক একটি মুক্ত," বলিতে বলিতে, মার মুখে লাল পড়ে। বালককাল হইতে নবীন কেরানিগিরীর পাকে চড়িয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ক্রম সময়ে আপিসে ঢুকিলেন, এখন সংসারও ঘাড়ে পড়িয়াছে। প্রত্যহ প্রভুর আরক্ত নয়ন স্ফীত বদন, কম্পিত ওষ্ঠ ও বিকৃত মুখ-ভঙ্গি উদরস্থ করিয়া নবীনের কষ্টের সীমা রহিল না। প্রভাতে ইষ্টদেবতার ধ্যান করিতে বসিলে প্রভুর সেই গোঁজমোহন মূর্ত্তি নয়ন পটে প্রতিফলিত হইয়া অধীর করিয়া তুলে। তবুও নবীন চাকুরী ত্যাগ করিতে পারে না;—কারণ কি? কারণ অনেক আছে। নবীনের পিতা কেরাণী ছিলেন, অতএব বুঝিয়া লইতে হইবে, কোন রূপে কষ্টে শ্রেষ্টে তিনি অল্পই ঋণ রাখিয়া ইহ সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। কারণ কেরাণীর গৃহে মাসের তেস্‌রা আর রজৎ মুদ্রার সংস্রব থাকে না বাকি ২৭ দিন উটনা বরাদ্দে চলিয়া থাকে ইহা একরূপ স্বতসিদ্ধ। তবে যাহাদের থাকে তাহাদের সংখ্যা গণনার মধ্যে আসে না। যাহা হউক নবীনের জোর কপাল বলিতে হইবে যে, তাহার পিতা অতি

অল্পই ঋণ রাখিয়া গিয়াছিলেন। নবীনও একজন চোতা কেরাণী, আহার একবেলা হইলে ভাল হয়, দুইবেলা হইলেই ধার। আপিসের ত কথাই নাই—তাহার উপর সংসারের এই কষ্ট—তবুও নবীন কর্ম্মত্যাগ করিতে পারেন না। পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে আছে কেবল, গোয়াল ঘর সমেত তিনখানি চালা, একটি বৃদ্ধ গরু, একটি টিনের পিলসুজ, একটি গোলপাতার ছাতি, একটি তুলসী গাছ, আর কতক ছেঁড়া মাদুর একটি লাউ মাচা, দুটি চকমকির বাক্স, আর কিছু ঋণ! এমন জমি নাই যে চাষ করিয়া খায়—এমন পয়সাও নাই যে মুড়ি মুড়কির ব্যবসা করে। তবে ২৫ ছুঁচ ও দো দেশালয়ের ব্যবসা চলিতে পারে বটে—কিন্তু তাহা হইলে সংসারে নির্জ্জলা একাদশীর ব্যবস্থা করিতে হয়—এই সকল দেখিয়া শুনিয়া নবীন চাকুরীর মায়া ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। আর বঙ্গ সংসারে নবীনের মেজরিটিই বেশি; কাযেই চাকুরী ভিন্ন পথ কোথায়? সুতরাং কেরানিগিরীর উপর আমাদের বিশ্বাস দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছে।

ইহাও নবীনের অবিদিত নাই যে তিনি তাঁহার ৩০ টাকার চাকুরীটি ত্যাগ করিলে এখনি সেই কার্য্য কত লোক ১৫ টাকায় স্বীকার করিবে। ফল আর কিছুই নয় কেবল, নিঃস্বার্থ প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা! হাতে হাতে নবীনের কর্ম্মচ্যুতি ও চালা একাদশী আর প্রভুর ১৫ টাকা লাভ! কাযেই নবীন স্থির করিয়াছেন:—"যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য" ইত্যাদি।

তাই বলিয়া কি নবীন চাকুরী করিতে ভালবাসে? চাকুরী করে বলিয়াই কি বঙ্গবাসী চাকুরীকে ভালবাসে? আজ কাল সকলের মনের ভাব দেখিয়া বোধ হয়—যদি একবেলা শাকান্ন পায় তাহা হইলে বঙ্গবাসী এ জঘন্যবৃত্তি এখনি ত্যাগ করে; কিন্তু ১২ আনা বঙ্গবাসীর তাহাও জোটে না। আজ কাল অনেকেরি ইচ্ছা ব্যবসা করা বা অন্য কোন স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন করা, কিন্তু তাহাওত মুখের কথা নয়—আর ছেলেখেলাও নয়। কাযেই বাঙ্গালি চাকুরীকে বেশ বিশ্বাস করে, আর না করিয়াই বা করে কি?

তোমার পত্র পাঠে বোধ হয় যেন, পত্রখানি লিখিবার সময়ে, আমরা কেরাণীর জাতি ও অব্যবসায়ী বলিয়া ঘৃণায় নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়াছিলে। কিন্তু বাস্তবিকই কি বর্ত্তমান বঙ্গীয় যুবক তাহার জন্য সম্পূর্ণ দোষী?

আমার কাঁচা বুদ্ধিতে যেরূপ এলো, বলে ফেল্লুম এখন তোমার কথা বল শুনি!

সেবক

শ্রীনন্দকিশোর শর্ম্মণঃ।

———

# খবরাখবর।

রাজনৈতিক আলোচনা সকল সময়ে বালকদের উপযোগা নহে, কিন্তু বালকে যে সকল প্রবন্ধ বাহির হইয়া থাকে দেখিতে পাই তাহা সাধারণতঃ বৃদ্ধ বালকদেরই পাঠ্য। তাই মনে করিয়াছি মাসে মাসে বালকে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ঘটনা ও সংবাদাদির একটা সংক্ষিপ্ত বিবরন প্রকাশ করিব। আজ আমরা গত দুই মাসের মধ্যে যে যে প্রধান প্রধান ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার বিবরণ দিব।

সকলের আগে বাঙ্গালায় জলপ্লাবন। বাঙ্গালি গত দুই মাসের বিবরণ লিখিতে বসিলে আর কোন্ কথা সর্ব্বাগ্রে লিখিতে পারে? বাঙ্গলার শ্রমজীবীদিগের এবার দুঃখের সীমা নাই। বীরভূম, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায়ত আগে হইতেই অন্নকষ্ট ছিল—অন্নাভাবে দুর্ব্বল হইয়া, অখাদ্য খাইয়া অনেক স্ত্রীপুরুষ জর ও আমাশয়ে প্রাণ হারাইতেছিল। তাহার উপর আবার এই ভয়ানক বন্যা। প্রায় সমস্ত দেশটাই জলে ডুবিয়া গিয়াছিল। শুধু যে শস্যই নষ্ট হইয়াছে তাহা নয়, সহস্র সহস্র ঘরবাড়ী বন্যার মুখে ভাসিয়া গিয়াছে, সহস্র সহস্র স্ত্রীপুরুষ গৃহ শূন্য হইয়া ফিরিতেছে। ইহার উপর আবার একটা সাইক্লোন্ প্রলয়ের ঝড়ের মত বঙ্গোপসাগর হইতে উঠিয়া অনেকগুলি লোকের প্রাণ ও সম্পত্তি হানি করিয়া গেল। এ সময়ে গবর্ণমেণ্ট কি করিতেছেন? অসংখ্য লোক অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে, সার রিভর্স টম্সন্, তাহাদিগের প্রাণ রক্ষা ও কষ্ট শান্তির জন্য কি করিতেছেন? দু চার হাজার টাকা করিয়া সরকার হইতে খরচ করিতেছেন, আর সভা করিয়া দেশীয় জমিদার প্রভৃতিকে চাঁদা দিতে বলিতেছেন। তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য দুঃখী প্রজাদিগকে কষ্ট দিয়া লাইসেন্স ট্যাক্স বলিয়া একটা ট্যাক্স আজ কয় বৎসর হইতে আদায় করা হয়। যখন লর্ড লিটন এই ট্যাক্স বসান তখন তিনি সমস্ত পৃথিবীর সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করেন যে এই ট্যাক্সের টাকা দ্বারা একটি দুর্ভিক্ষনিবারিণী ফণ্ড সংস্থাপন করা হইবে—তাহার একটি পয়সাও দুর্ভিক্ষ কষ্ট প্রশমন ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হইবে না। (সেদিন আমাদের নূতন ষ্টেট্ সেক্রেটরি লর্ড র‍্যাণ্ডল্ফ পার্লেমেণ্টে বলিয়াছেন যে রুশীয়ার সহিত যুদ্ধোদ্যমের ব্যয়ে দুর্ভিক্ষনিবারিণী ফণ্ডের টাকা সমস্ত খরচ হইয়া গিয়াছে। স্যার রিভর্স্ টম্সনও কার্য্যতঃ তাই বলিতেছেন—তবে তফাৎ এই যে ষ্টেট্ সেক্রেটরি দুর্ভিক্ষনিবারণী ফণ্ডের যে অসদ্ব্যবহার হইয়াছে তাহা স্পষ্ট বলিয়া ফেলিয়াছেন, আর আমাদের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর তাহা না বলিয়া, "বাঙ্গালায় অন্নকষ্ট নাই থাকিলেও অতি সামান্য," এই অদ্ভুত কথা বলিতেছেন। আসল কথা, গবর্ণমেণ্ট রুশীয়ার ভয়ে অনেক টাকা খরচ করিয়া বসিয়াছেন, আরো অনেক টাকা খরচ করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন—প্রজা মরে

মরুক, গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয় হউক, দুর্ভিক্ষনিবারণী ফণ্ডের টাকা রুশভয় নিবারণেই ব্যয় হইবে। আমরা বলি রুশভয় অপেক্ষা প্রতিজ্ঞা হানি ভয় গবর্ণমেণ্টের অধিক হওয়া উচিত। গবর্ণমেণ্টের কোটি কোটি প্রজা যখন দেখিবে যে গবর্ণমেণ্ট আপনার বাক্য রক্ষা করেন না তখন তাহারা গবর্ণমেণ্টের ভয়ের কারণ হইবে।

দুর্ভিক্ষনিবারণী ফণ্ডের কথায় রুশীয়ার সহিত যুদ্ধের আশঙ্কা, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমা সংরক্ষণ আফগানীস্থানের উত্তর-পশ্চিম সীমা নির্ণয়, ভারতীয় সেনাবৃদ্ধি প্রভৃতি প্রশ্ন মনে পড়িল। গত দুই মাসে এই কূট প্রশ্ন গুলি লইয়া ঘোর আন্দোলন হইয়াছে। রুশীয়া মধ্য আসিয়ায় ক্রমে রাজ্য বিস্তার করিতেছেন। ইংলণ্ড বহুকাল অবধি বলিয়া আসিয়াছেন রুশীয়াকে আফগানীস্থানে পদার্পণ করিতে দিবেন না—আফ-গানীস্থানের সহিত কোন প্রকার রাজনৈতিক সম্বন্ধ পর্য্যন্ত রাখিতে দিবেন না, কেন না আফগানীস্থানে রুশীয়া প্রবল হইলে তাহার পক্ষে ভারতাক্রমণ অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া দাঁড়াইবে। রুশীয়া অপর দিগে, "আমরা আফগানীস্থান চাহি না" বলিয়াও আফগানীস্থানের দিগে ক্রমেই অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া গত বৎসর রুশীয়ার সহিত পরামর্শ করিয়া ইংলণ্ড সীমা নির্ণয় কমিশন্ (Boundary commission) নামে জন কতক লোক নিযুক্ত করিয়া আফগানীস্থানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত দেশে পাঠান। রুশীয়াও এক কমিশন্ পাঠাইবেন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু পাঠান নাই। ইতিমধ্যে পঞ্জদে নামক স্থানে আফগান ও রুশীয় সৈন্যে যুদ্ধ বাধিয়া উঠা এক প্রকার স্থির হয়; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে হয় নাই। ইংলণ্ড ও রুশীয়াতে যুদ্ধ বাধিলে গরিব ভারতবাসীর আর দুঃখের সীমা থাকিত না—লক্ষ লক্ষ ভারত-সন্তান যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইত; যুদ্ধ ব্যয় দরিদ্র ভারতবাসীর বহন করিতে হইত—সে ভার বহন করিয়া তাহার যে এক সন্ধ্যা কোন মতে এখন অন্ন জোটে তাহাও জুটিত না। রুশীয়া এখন কমিশন্ পাঠাইবেন বলিয়াছেন। আমাদের কমিশন্ তো কার্য্যক্ষেত্রেই আছেন। যে সীমা নির্ণয়ের জন্য কমিশন্ নিযুক্ত হইয়াছে তাহা লণ্ডনে ও সেণ্টপিটর্সবর্গেই নির্ণীত হইয়াছে—কমিশনর-গণ কেবল একটা জরিপ করিয়া কার্য্য সমাধা করিবেন। আমাদের গবর্ণমেণ্ট যে কি সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া এত অর্থ নষ্ট করিয়া একটা কমিশন্ পাঠাইলেন আমরা বুঝিতে পারি না। আফগানীস্থানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে একটা রেখা টানিয়া আসি-লেই কি রুশীয়ার গতি রুদ্ধ হইবে? রুশীয় গবর্ণমেণ্টের মুখপাত্র নভি ভ্রেমিয়া (Nove Vremiya) নামক সংবাদ পত্র ইতিমধ্যেই এই কমিশন্ নিয়োগ ব্যাপারকে বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, আর বলিতেছে রুশীয়ার যেখানে প্রয়োজন সেখানে রুশীয়া যাইবেই—তাহার পথ কে বন্ধ করিতে পারে? লাভের মধ্যে এই হইল দুঃখী ভারতবাসীর অনেক-গুলি অর্থ নষ্ট হইল।

এইরূপে আপোসে আফগান সীমা নির্ণয় হইয়াছে বলিয়া—সীমা প্রকৃতপক্ষে লণ্ডন ও

সেণ্টপিটর্স্‌বর্গে নির্ণীত হইয়াই গিয়াছে—সংপ্রতি রুশায়ার সহিত যুদ্ধের কোন অ. নাই। তবে এ মীমাংসা সমুদ্রে বালির বাঁধের মত—মুহূর্ত্তের জন্যও ইহার উপর ভরসা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। ইংলণ্ড তাই ভারতবর্ষকে সুরক্ষিত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সীমান্ত প্রদেশে রেলওয়ে নির্ম্মাণ হইতেছে, দুর্গ নির্ম্মাণ হইবে, ভারতী সেনায় প্রায় ২৫ শ হাজার নূতন দেশীয় ও ব্রিটিশ সৈন্য যোজিত হইবে। এতে যে কোটি কোটি টাকা খরচ হইবে তাহা কোথা হইতে আসিবে? গবর্ণমেণ্ট হিসাব করিয়াছেন এই সেনা বৃদ্ধি ও আয়োজনে অন্যূন আড়াই ক্রোড় টাকা টাকা বৎসর বৎসর খরচ হইবে। সীমা নির্ণয় কমিশন, রাউয়ালপিণ্ডী দরবার, রুশীয়ার সহিত যুদ্ধের উদ্যমে সাড়ে তিন ক্রোড় টাকা ইতি পূর্ব্বে খরচ হইয়াছে—তার উপর এখন গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন ভারতবর্ষের বার্ষিক ব্যয় অন্যূন আড়াই ক্রোড় টাকা বাড়িল। আমরা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি এ টাকা কোথা হইতে আসিবে? গবর্ণমেণ্ট বলেন এ টাকা কতক রেলওয়ে প্রভৃতি পব্‌লিক ওয়ার্কস (Public works) নির্ম্মাণ বন্ধ করিয়া, কতক ধার করিয়া, কতক নূতন ট্যাক্স বসাইয়া উঠাইবেন। গবর্ণমেণ্ট যাহা বলিতেছেন তাহা করিবেনই; কেননা একে আমরা পরাধীন জাতি, তাহাতে সরকারী কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করিবার আমাদিগের কোন রকম অধিকারই নাই। গবর্ণর জেনেরল এখানে, আর ষ্টেট্‌সেক্রেটরী ইংলণ্ডে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। পার্লেমেণ্টে বা ষ্টেট্‌সেক্রেটরীর কৌন্সিলে আমাদিগের কথা বলে এমন কেহ নাই—গবর্ণরজেনেরলের কৌন্সিলে দেশীয় সভ্য যাঁহারা আছেন তাঁহারা কিছুই করিতে পারেন না, কেননা ট্যাক্স প্রভৃতি বসান, যুদ্ধাদি আরম্ভ করা, ভারতবর্ষের অর্থ ব্যয় করা, এসব বিষয়ে কি দেশীয় কি ইংলণ্ডীয় কোন সভ্যেরই কোন মতামত লওয়া হয় না। তাই আমাদের প্রাণ ও টাকা লইয়া গবর্ণমেণ্ট যে খেলা ইচ্ছা তাহাই খেলিতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডে পার্লেমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত একটি পয়সাও ট্যাক্স বসাইতে পারেন না, একটি পয়সাও খরচ করিতে পারেন না, তাই ইংলণ্ডের টাকায় গবর্ণমেণ্ট কথায় কথায় লড়াই করিবার জন্য টাকা খরচ করিতে পারেন না। কিন্তু এদেশে কেহ উচ্য বাচ্য করিবার নাই, তাই গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের মান বজায় রাখিবার বা বাড়াইবার জন্য ভারতবর্ষের টাকায় লড়াই করিতে এত প্রস্তুত। এই যে রুশীয়ার সঙ্গে যুদ্ধের আশঙ্কায় খরচ, এই খরচটা কাহার দেওয়া উচিত, ইংলণ্ডের কি ভারতবর্ষের? আমরা দেখাইব এই খরচাটা সমস্ত ইংলণ্ডের দেওয়া উচিত। ভারতবর্ষ যেমন ইংলণ্ডের অধীন অষ্ট্রেলীয়া, কানেডা কেপ্‌কলনী প্রভৃতিও তেমনি ইংলণ্ডের অধীন। ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে কি ভাবে শাসন করেন আর অষ্ট্রেলীয়া প্রভৃতিকে কি ভাবে শাসন করেন একবার দেখ। লোকে মূল্য দিয়া জিনিষ ক্রয় করে—ইংলণ্ড মূল্য দিয়া অষ্ট্রেলীয়া কানেডা প্রভৃতি ক্রয় করিয়াছেন, অর্থাৎ আপনার অর্থ

ব্যয় করিয়া ঐ সব দেশে ইংলণ্ডের আধিপত্য বিস্তার বা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। আর ভারতবর্ষ বিনা মূল্যে কিনিয়াছেন—অর্থাৎ ভারতবর্ষ অধিকার করিতে যে শত শত ক্রোড় টাকা ব্যায় হইয়াছে তাহার একটি পয়সা পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে আদায় করিয়াছেন। আমাদের যে জাতীয় ঋণ (National debt) আছে তাহা এই ভারতাধিকার ব্যয়ের টাকা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আমাদের জাতীয় ঋণ প্রায় আড়াইশ ক্রোড় টাকা। ভারতবর্ষীয়েরা এ টাকা কবে কর্জ্জ করিল? ইংলণ্ড আপনার স্বার্থের জন্যে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন, অধিকারের ব্যয় এই যে আড়াইশ ক্রোড় টাকা তাহাকে "ভারতীয় জাতীয় ঋণ" নাম দিয়া ভারতবর্ষের স্কন্ধে চাপাইয়াছেন। এই জাতীয় ঋণের জন্য আমাদিগকে বৎসরে বৎসরে প্রায় ১২ ক্রোড় টাকা করিয়া স্থদ দিতে হয়—এই বার ক্রোড় টাকা দুঃখী ভারতবাসীর রক্ত শোষণ করিয়া ট্যাক্স রূপে আদায় করা হয়। এইরূপে তো বিনা পয়সায় সোনার ভারত ইংলণ্ড কিনিলেন। তার পর দেখ অষ্ট্রেলীয়া, কানেডা প্রভৃতি ইংলণ্ড আপনার অর্থ ব্যয় করিয়া রক্ষা করেন—অর্থাৎ ঐ সব দেশের সৈন্য সামন্তের, যুদ্ধ-জাহাজের, যে খরচ ইংলণ্ড তাহা সমস্তই বহন করেন। আর ভারতবর্ষের সৈন্য সামন্ত, যুদ্ধ-জাহাজ, সকলের খরচই ভারতবর্ষকে দিতে হয়। ভারতবর্ষের বার্ষিক সৈনিক খরচ প্রায় বিশ ক্রোড় টাকা। যদি ইংলণ্ড এ খরচ বহন করিতেন তবে কি আর সোনার ভারত ভিখারীর দেশ হইয়া দাঁড়াইত? আমরা উপরে বলিয়াছি যে ভারতবর্ষ অধিকার করিতে যে শত শত ক্রোড় টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহা ভারতবর্ষ হইতেই ইংলণ্ড উঠাইয়াছেন—কেবল ইহাই নহে, ভারতবর্ষের ব্যয়ে ইংলণ্ড অন্যান্য দেশও দখল করিয়াছেন। তাহার বিবরণ দেওয়ার স্থান এ নয়। অষ্ট্রেলীয়া, কানেডা প্রভৃতি নগদ টাকাও বৎসর বৎসর পাইয়া থাকে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড কানেডাকে প্রায় এক ক্রোড় টাকা দেন। জামেকা ইংলণ্ড হইতে বৎসর বৎসর ১৭। ১৮ লক্ষ টাকা পায়—নভা স্কশিয়া ১৫ লক্ষ। আবার দেখ অষ্ট্রেলীয়া কানেডা প্রভৃতিকে স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া হইয়াছে। তাহাদিগের আপনার আপনার পার্লেমেণ্ট আছে—দেশীয়েরাই সভ্য নির্ব্বাচন ও নিয়োগ করে—ইংলণ্ডও যেমন স্বায়ত্ব শাসনাধীন—কানেডাদিও তেমনি স্বায়ত্ত শাসনাধীন কেবল নাম মাত্র ইংলণ্ডের অধীন, কেন না সে সব দেশে ইংলণ্ড একটি পয়সাও ট্যাক্স বসাইতে পারেন না—সে সব দেশের ইংলণ্ড একটি পয়সাও খরচ করিতে পারেন না। এক কথায় পার্থক্যটা এই—অষ্ট্রেলীয়া, কানেডা প্রভৃতি ইংলণ্ড নিজ ব্যয়ে অধিকার করিয়াছেন, তাহাদিগকে স্বায়ত্তশাসন দিয়াছেন, নিজ ব্যয়ে তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন, তাহার উপর অর্থ সাহায্য করিতেছেন—আর ভারতবর্ষের অর্থে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন, তাহাকে দাসের মত পদতলে রাখিয়াছেন, তাহার আপন ব্যয়ে তাহাকে রক্ষণ করিতেছেন, তাহার উপর ক্রোড় ক্রোড় টাকা বৎসরে বৎসর তাহার রক্ত শোষণ করিয়া লইতে-